নল খাগড়া

ঊষা দেবী সরস্বতী

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

প্রথম প্রকাশ : ১৩ই মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্রীকিরীটিকুমার পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮/৪এ, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদচিত্র
শিল্পী অজিত গুপ্ত

পরিকল্পনা
শ্রীসত্যনারায়ণ দে

নিয়ন্ত্রণ
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত

মোটা পোলতেয় রেড়ির তেলে বড় আকারের মাটির পিদিমটা লম্বা শীষ তুলে জ্বলছিল। স্নিগ্ধ আলো কালিহীন। মোটা পৈতেয় এলো গা, বুক-ভরা লোম; খড়্গ নাক, বিকশিত ঈষৎ ট্যারা চোখ ছ-ফুট লম্বা দশাসই চেহারার সিদ্ধেশ্বর রায় চৌধুরী মাটির দোতলা বাড়ির নিচে পাড়ার লোকজন আর জন-মজুরদের সামনে কথা বলছিলেন। এলো গায়ে কালোকালো চেহারার লোকগুলো বাবা ঠাকুরের কথা বেদবাক্যের মতো মন দিয়ে শুনছিল।

বাবা ঠাকুর বলছিলেন, 'আমার ঠাকুর দাদা বৃন্দাবন রায় চৌধুরী তাঁর বড় বউদিদিকে খুব ভালবাসতেন। বড় বউদিদির তখন দুটি ছেলেমেয়ে—সাপে কেটে বড় দাদা হরিহর রায়চৌধুরী মারা গেলেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। চন্দ্রবোড়া কামড়ানোর পর কত ডাক-সাইটে ওঝা এলো—কেউ বাঁচাতে পারল না। চব্বিশ ঘণ্টা পরে রোগী ফুলে ফেটে রক্তরস ঝরে নাক-মুখ দিয়ে গাঁজলা উথলে বেরিয়ে মারা যেতে বড়বউদিদি যেন পাথর হয়ে গেল! কাঁদে না কেন? দুটো বাচ্চাকে কোলে দেওয়া হল। শেষে ঠাকুরদাদার মা নন্দরানী এসে পিঠে লাথি মারলেন। পুত্রশোকে তিনি নাকি পাগল পারা! বউ অপয়া। বুড়ি বললেন, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ বিন্দে নইলে পালাবে। সোয়ামীর মরণ শোকের চাইতে এখন ভাবনা ওর পরাণে বাঁচার। মায়ের হুকুমে বাধ্য হয়ে বৃন্দাবন ঠাকুরদাদা দেওর হয়েও বউদিদিকে বাঁধলেন। কেননা বাবাও হুকুম দিলেন। খুব সুন্দরী মেয়ে। সবে দু-ছেলেমেয়ের মা। আঠার বছর বয়েস। বাচ্চা দুটো মায়ের দুর্দশায় কাঁদতে থাকে। হরিহর রায়চৌধুরীর মৃতদেহ হরিধ্বনি দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ইন্দুলেখাকে বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে যাওয়া হল। শ্মশানে চিতার আগুন জ্বলে উঠতে তাতে ঘি ঢালা হল। ঢাক-ঢোল কাঁসি চচ্চড়ি বাজতে লাগল। ইন্দুলেখাকে স্নান করিয়ে 'সতীদাহ' করার জন্যে চিতায় চড়াবার সময় বামুন ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'ভয় করো না মা, প্রাণের মায়া করো না—পাপ হয়! হাসতে হাসতে চলে যাও। ইহকালের এই মানবদেহ কিছুই নয়—এ শুধু মায়া। পরকালে তুমি স্বামী-দেবতার সঙ্গে অনন্ত সুখে স্বর্গবাস করবে।...

'না। এসব মিথ্যা প্রবঞ্চনা। জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা পাপ! আপনারা পাপী! আমি মরতে চাই না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমার

বাচ্চারা কাঁদছে। আমি মা!…' পাগলের মতন বিলাপ করতে লাগল ইন্দুলেখা।

বামুন ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'তুমি বালবিধবা তুল্যা। তোমার যৌবন-কামনা আছে। স্বামী না থাকলে তুমি পাপাচার করবে। সমাজকে গোল্লায় দেবে। বিধবা নারীর মুখদর্শন করতে' নেই। সে হল নরকের দুয়ার। বিভীষণ অগ্নিকুণ্ড।…'

ঢাক ঢোল বাজতে লাগল। মাতালরা নাচতে লাগল ভূত প্রেতের মতো। ইন্দুলেখা পাগলের মতো ভীষণ তেজে দড়িফড়ি ছিঁড়ে বামুনঠাকুরকে কামড়ে তাঁর কান কেটে নিলে তাকে জোর করে ধরে আগুনের মধ্যে ফেলে রেখে লাঠিসোটা মেরে জখম করে দেওয়া হল। যাহোক, চিতার আগুন নিভে গেল।

ঠাকুরদাদা বলেছিলেন, এই পৈশাচিক দৃশ্য আমার ভাল লাগে নি। তাঁর মা বুড়ি আগেই মারা গেলেন—বুড়ো বাবা মরলেন তারপর। ঠাকুর দাদার পিসিমা আর পিসেমশায় এসে বাস করতেন তাঁদের বাড়িতে। পিসেমশায় মারা যাবার আগেই পিসিমা পুড়ে মরার ভয়ে কোথায় পলাতক হয়ে গেলেন। তারপর রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণ হয়েও খিরিস্টানদের সঙ্গে মিশে ইংরিজি শিখে লর্ড বেন্টিঙ্ক সাহেবের সহায়তায় আইন করে সতীদাহ প্রথা রদ করে দিলেন। ঢোল সহরত করে জানিয়ে দেওয়া হল একাজ যদি কেউ করে তবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। একটা গোঁড়া হিন্দুপ্রথা রদ হয়ে যাওয়াতে বড় বড় বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার বামুন ঠাকুররা বিরূপ হলেন। হুকুম জারী করলেন বাল্য বিধবা বা যুবতী বিধবাদের যদি বাপ-ভায়ের সংসারে রাখতেই হয় তবে তাদের শ্রীহীন করে রাখো। অনেকেই তাদের ন্যাড়া করে দিত।…'

'কাজটা কি ভাল?' ঘাড় তুলে কথা বলল রমানাথ সরদার। আপনার মতো জ্ঞানী মানুষও তো নিজের বালবিধবা কন্যা ঐটুকু মেয়েটিকে সংযমের নাম করে একবেলা উপোসী ও অসাধারণ কৃচ্ছ্রতা ও কষ্টকর জীবনের জবরদস্তি অভ্যাসের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। চুল কেটে দিয়ে আটহাতি কাপড় পরিয়ে শ্রীহীন করে রেখেছেন। এটা কি মানুষের মতো কাজ হয়েছে?

চিৎকার করে উঠলেন সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী, 'তুই হারামজাদা কি আমাকে 'অমানুষ' বলতে চাস? এটা তো প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবছিস না কেন আমার মেয়ে স্বর্ণলতা যে রকম সুন্দরী সে যদি বিধবা থেকে পাপাচার করত? তুই হারামজাদা মোছলমান মৌলুবী নিয়ামত হোসেনের কাছে নাকি ওঠা-বসা

করছিস। কানে আসে সব কথা। বাগ্‌দি ছোট-জাত হয়ে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস? বেরিয়ে যা এখান থেকে।' খড়ম ছুঁড়লেন সিদ্ধেশ্বর বাবা ঠাকুর।

মাথায় লাগল রমানাথ সরদারের। 'বাপরে' বলে মাথা চেপে ধরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল সে। কেটে গিয়ে রক্ত গড়াল। রমানাথের হাতময় রক্ত!

কোঁড়া তোলা খড়মটা একজন কুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে এলো। সভা ভঙ্গ হয়ে গেল।

বাবা চলে যেতে উঁকি মারল স্বর্ণলতা। আট হাতি ময়লা জোলার বাড়ির ভুনি কাপড় পরা মেয়ের চেহারা যেন যৌবন ভরা ভাদরের নদী।

লোকগুলো সবাই তখন পালিয়ে গেছে। বাবা ঠাকুর লোক এমনিতে ভাল কিন্তু রাগলে একেবারে চণ্ডাল। দামকড়ি আর কেউ পেল না। একদিনের কাজের বিনিময়ে পাবে চল্লিশটা কড়ি অথবা কুড়িটা পয়সা কিম্বা একপালি ধান। নয়তো একদোন চাল।…(একপালিতে পাঁচ সের—একদোনে তিন সের পাঁচ ছটাক)

'মাথায় খুব লেগেছে! ইস, কত রক্ত।' বলল স্বর্ণলতা।

'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি বাগ্‌দি।' কাতর স্বরে বলল রমানাথ।

'আমি মানি না।' পিদিমটা নিভিয়ে দিল স্বর্ণলতা। বাইরে তখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো।

'তুমি তো এ বাড়িতে একটা দাসীর মতো আছ।' উঠে বসেছিল রমানাথ।

আমার ভাগ্য। বলল স্বর্ণলতা।

—'ভাগ্য! শালা, মানুষ মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, বলে ভাগ্য।—চলি আমি বিদায়! তোমাদের বাড়ি আর আসব না। বাবা ঠাকুর আমাকে 'নাগাড়ে-জন' করে রেখে পশু বানাতে চান—মানুষ হতে দিতে চান না। আমি বাগ্‌দির ছেলে হয়ে খানিকটা লেখাপড়া শিখেছি বলে তোমার বাবা বলেন, ছোটজাতের ছেলে লেখাপড়া শিখলে কি মানুষ হয়ে যাবে? একদিন আমি গীতা নিয়ে শ্লোক মুখস্থ করছিলুম দেখে কী মারোন মারলেন ধর্মপুস্তক ছোঁয়ার অপরাধে। ছোটজাত হয়ে সংস্কৃত শিখে ওসব উচ্চারণ করলে নাকি জিভ খসে যাবে।'

—'তুমি আর আসবে না তো গোয়ালের গরু সকালে বার করবে কে? দুপুরে তাদের জল খাওয়াবে কে? সন্ধ্যায় আনবে কে? কে জনেদের মুড়ি নিয়ে যাবে, জ্বালানী কাঠ যোগাড় করে দেবে, জাল ফেলে মাছ ধরে দেবে?'

—'আর একবার বাবাঠাকুর মারলেন, ছিপ ফেলে মাছ ধরার সময় বলে ফেলেছিলুম, শালার মাছটা যে গরুর মতন টান দিয়েছিল! গরু বলেছি মাছটাকে —তাই পিঠে লাথি মারলেন। আমাদের ছোঁয়া নিষেধ কিন্তু লাথি মারলে দোষ নেই!—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। কত লোক পাবে। তোমরা বড়লোক। যাই আমি। একটা কথা আমি বলে যাই—হয়তো আমি ধর্ম ত্যাগ করে 'যবন' মোছলমান হব। অত্যাচার আর সহ্য হয় না।

বাগ্‌দি ছোটজাত আমি। যে জাতের মধ্যে ছোট বড়র ভেদাভেদ নেই—সবাই এক সাথে এক পাতে খায়—মানুষে মানুষে সমান অধিকার পায় সেই ধর্মে জাত দোব।' কাঁদতে লাগল রমানাথ।

হাত ধরে ফেলল হঠাৎ স্বর্ণলতা। বলল, 'আমাকে ভুলে যাবে?'

'স্বর্ণ!' মায়ের ডাক পড়ল ঠিক সেই সময়ে।

হাত ছাড়িয়ে দিল রমানাথ। চলে গেল সে।

জোছনা রাতে তার মূর্তিটা খানিকক্ষণ দেখা যাবার পর মিলিয়ে গেল।

স্বর্ণলতা ভেতরে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ালে তার মা বললেন, 'পোড়ামুখী, তুই মরিস্‌নি কেন বলতো, মরলে তো তোরও হাড় জুড়োয়। তোর দাদার ঘর থেকে তুই আমসত্ত চুরি করে খেয়েছিস? বউমা বলছিল, কে আবার খাবে? হুলো বেড়াল আছে বাড়িতে। বাপের বাড়ি থেকে আমসত্ত এনে রেখেছিলুম…'

'আমি তো খাইনি মা!'

'মর মুখপুড়ি, ভাতারখাকি! তুই খাবি নি তো কে খাবে? সে পোয়াতি মেয়ে, এসময়টা একটু টক খাবার ইচ্ছায় মৌরী-এলাচ দেওয়া বাপের বাড়ির আমসত্ত এনে রেখেছে কোথায় আর তুই…'

'না মা, ঠাকুরের দিব্যি…'

'বেরো আমার সামনে থেকে। কাপড়টা তোর পাটামাটি দিয়ে সেদ্ধ করতে কি হয়? দেখলে ঘেন্না করে।…গন্ধ বেরিয়েছে।'

গামছা পরে এখন সেদ্ধ করে দোব?'

কি পরে দিবি তুই জানিস। তোর আবার লজ্জা-শরম কিসের? কে তোর দিকে তাকাবে? যেমন ভাগ্য নিয়ে এসেছিস তেমন 'ছেরকাল' জ্বলে পুড়ে মর।'…

স্বর্ণলতা গামছা পরে মাটির হাঁড়িতে কাপড়খানা সেদ্ধ করতে বসে।

চার ভাই বাবা আর ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর মেয়েরা খেয়ে নেয়।

স্বর্ণর ভাত তাকে নিজে রেঁধে নিতে হয় আলাদা করে নিরামিষ ঘরে। তার খাওয়া একবেলা। আর একাদশীর দিনরাত্রি নিরম্বু উপবাস্। তার শোবার জায়গাও আলাদা। ছোট্ট একটা খোপঘরের মধ্যে তক্তাপোষের ওপরে তার ময়লা কাঁথা বিছানো পড়ে থাকে।

মাটির দোতলা হলেও খুবই মজবুত। কাঠের খুঁটি, কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ডাকাতও ঢুকতে পারবে না।

পিদিমের আলোয় স্বর্ণ হাত আয়না ধরে নিজের মুখখানা দেখে মাঝে মাঝে যেদিন তার ঘুম হয় না।

কিন্তু সে যে 'কোড়ে-রাঁড়ী'। বাল-বিধবা। যৌবন আসার লক্ষণ দেখা দেবার সময়েই তার এক সুকুমার নওল কিশোরের বিয়ে হয়। মাত্র দু-বার ঘরকন্না করতে গিয়েছিল। ছ'-মাস পার না হতে হতেই তার ভাগ্য ভেঙে গেল। স্বামী মারা গেল ভেদবমি হয়ে।···

এগারো বছরের মেয়ে তেরো বছরে বিধবা হল। যৌবনের ক্রিয়াকলাপ সে জানত না। সে ছিল যেন শিশুকালের বউ সাজার খেলা? রজনীকান্তর ঘরে তার ঠাকুরমা স্বর্ণকে জোর করে ঢুকিয়ে দিত। রজনীর আলিঙ্গনের মধ্যে সে কাঁপত কবুতরের মতো।···

গলা কাঁঠাল আর রসা ইলিশমাছ খেয়ে রজনীর পেট নামল। তাকে সে ভালবেসে ফেলেছিল। দুজনে এক সঙ্গে সাঁতার কাটত। বাগানে দৌড়-ঝাঁপ করত। বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে গিয়েছিল। ওর ঠাকুরমা বুড়ি বলত, 'খেলুক দু-জনে। খেলার সাথীই তো। জীবন ভর খেলবে। ওলো নাতবৌ, লোক এলে ঘোমটা দিবি।'

সে ছিল যেন কলাবউ!

বেশ মনে পড়ে, রজনীর খুড়তুতো ঠাকুরদাদা হুগলীর ডাকাতে কালী মন্দিরের পূজারী হয়ে থাকতেন, দেশে ফিরে নাত বউ দেখতে এলে ঠাকুরমা তাকে বসিয়ে ঘোমটা দিতে বললে আর কানে কানে কিছু বলেও দিলে।

ঘোমটা তুলতেই দেখা গেল জিভ বের করা কালী!

এখন আয়নার আলোয় নিজের মুখখানা দেখতে গেলে তার কষ্ট হয়।

স্বর্ণর মাথায় ছিল অগাধ চুল। চোখ দুটো বড় বড়—মায়াময়—যেন

হরিণের চোখ। বাবার মতো তার তীক্ষ্ন নাক। ঠোঁট দুটো টেপা। বয়স বোধহয় এখন কুড়ি বছর হয়ে গেল।

একদিন বাগানে ঝড়ের সন্ধ্যায় আম কুড়োবার সময় মুষল ধারায় বৃষ্টি নামলে বিশাল মহীরুহের তলায় ঝোড়া ভরা পাকা-কাঁচা আম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় রমানাথও সঙ্গে ছিল। চিক্কুর হেসে আকাশ ভেঙে পড়ে ঘন ঘন। বাজ পড়ার শব্দে ভীষণ ভয় পায় স্বর্ণ। বাড়িতে থাকলে তক্তাপোষের তলায় লুকোত ছোটবেলায় দিদির সঙ্গে।

সেদিন ভয়ে রমানাথের বুকের ভেতরে সে আশ্রয় নিয়েছিল। রজনীর বুকের ভেতরে যেমন করে কাঁপত তার চেয়ে শতগুণ বেশি কাঁপুনীতে সে যেন থরথর করেছিল।

রমানাথ সরদার বিশ্বাসী আর সরল। নির্বোধও বেশ খানিকটা। বলেছিল দিদিঠাকুরোন, পালাও। ভিজেই তো গেছ। কেউ দেখে ফেলে বাবাঠাকুরকে বলে দিলে জলন্ত কাঠ আমার পেটের মধ্যে গুঁজে দেবে।'

আমের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে রমানাথই শেষবেলায় পালিয়ে এলো। কেননা ঝড় উঠেছিল তখন মারমূর্তিতে প্রচণ্ডতর। গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ছিল।

অকস্মাৎ প্রাণের ভয় যেন হারিয়ে গেল স্বর্ণর চরম এক ব্যর্থতায়। সে ঘৃণ্য, উচ্ছিষ্ট !···

ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সেই বৃষ্টি ঝড়ের মধ্যে বলতে লাগল, 'ভগবান, আমার মাথায় বাজ পড়ুক! হে ভগবান, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরে ফেল!···'

'পাগল হয়ে গেছ? রমানাথ স্বর্ণকে সেই সন্ধ্যার আঁধারে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে খিড়কির বারান্দায় নামিয়ে দেয়। স্বর্ণ-জোর করে ধরে তার মুখে চুমো খেয়ে দিয়েছিল। কই, বাগ্‌দির মুখে তো পচা শামুকের গন্ধ পায়নি?

সেবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আমি ডাইনী হয়ে গেছি!'

রমানাথ তাড়া মেরেছিল, 'চোপ, এসব কথা একদম ভাববে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বর্ণলতা।···

[২]

নোদাখালী গ্রামের ঘোষের বাগানের মাঝখানে যেখানে এখন জোলো খাঁর বন, মোগল আমলের পড়ো ভিটে যার তলায়. পাশেই ঈদগা, মসজিদ,

শানের পুকুর, বহুকালের বুড়ো বেলগাছ, ওখানেই থাকতেন আলাউদ্দিন কাজী তাঁর চার বিবি, বাচ্চাকাচ্চা আর আরবী ঘোড়া নিয়ে। তিনি নাকি মোগল দরবারের কোনো আমীরের পুত্র ছিলেন। তাঁর ছিল দীর্ঘ ঋজু দেহ। কোমরে ঝুলত তলোয়ার। মাথায় থাকত তাজ। গদিতে বসে বিচার করতেন।

জোলো খাঁর বনে কোঁড়া-লাগানো রুপো আর তামার টাকা-পয়সা কুড়িয়ে পাওয়া যেত ভাঙা ইট-পাটকেল সরাতে গিয়ে। তাতে আরবী অক্ষরে লেখা ছিল শাহানশা আলমগীর।

ইংরেজ আমল এসে যাবার পর মুসমান উজির-নাজির-কুতুব-মোক্তার-হাওলদার মুফ্‌তি-কাজী-মোল্লা-রেইসদের প্রাধান্য অস্তমিত হয়ে এলো। লাখেরাজ, পীরোত্তর, ওয়াকৃফ সম্পত্তির ভরসায় তাঁদের চলমান জীবনের গতি যে ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছিল সে খেয়াল করার প্রবৃত্তিও তাঁদের ছিল না।

নবাব-উজির-নাজির—কাজী-সৈয়দরা 'আশরাফ' (উচ্চবর্ণ) বা শরীফজাদা হয়ে খানদানী কেতা বজায় রেখে 'তাঞ্জামে' চড়ে সদরে যেতেন সরকারী মাসোহারা নিতে। নবাবরা রাখতেন চারটে করে খাপসুরত বিবি সাহেবা। আর মসজিদে রাখতেন খাস আরবের ইমাম। একশো বছর চলে যাবায় পরও তাঁরা অন্ধকারে তলোয়ার ঘুরচ্ছিলেন—আজো আমরা নবাব আছি।

জোলো খাঁর প্রাসাদের অদূরেই পশ্চিমদিকের একটি ছোট কাঠ কয়লায় বানানো ইটের বাড়িতে নিয়ামত হোসেন ইমামের কাজ শুধু সাঙ্গ করতেন না, ইসলাম ধর্মপ্রচার আর পালনের দিকে যেমন চোখ রেখেছিলেন তেমনি মুসলমান বানানোর দিকেও।

তিনি রমানাথকে বসিয়ে টুপি খুলে ন্যাড়া মাথা মুছে আবার টুপি পরলেন। রমানাথের জীবনের সবকথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। বললেন, 'মাটি বা পাথরের ঠাকুর পূজো করা শেরক্ মহাপাপ, যে পাপের মাফ নেই। একমাত্র নিরাকার আল্লাহ-তায়ালাই উপাস্য। চলো আমার সঙ্গে চণ্ডীপুর গাঁয়ে, সেখানে 'মিলাদ শরীফ' (ধর্মসভা) হবে। আমি বা আরো দুজন মৌলবী 'বয়ান' (বর্ণনা) করবো, শুনবে। যদি 'দোজখের' (নরকের) আগুন থেকে আল্লা-রসুলের দয়ায় নিস্তার পেতে চাও তবে অবিলম্বে মুসলমান হও। আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। কেউ কাউকে ঘৃণা করে না 'ছোটজাত' বলে। একপাতে একসাথে খাওয়া ইসলামে বড় অধিকার। রাজার পাশে ফকিরও নামাজ পড়তে পারে। মুসলমান হলে ইমান' (বিশ্বাস) ঠিক রাখতে হবে। মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। ওজু'তে (পবিত্রতায়) থাকতে হবে।'

মৌলবী নিয়ামতের সঙ্গে গেল রমানাথ। চণ্ডীপুর গ্রামের মিলাদ মহফিলে চাঁদোয়া টাঙানো তক্তাপোষের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বক্তৃতা করতে লাগলেন নিয়ামত হোসেন। অনেক নবদীক্ষিত মুসলমান এসেছে মাথায় টুপি মুখে দাড়ি। হিন্দুর ছেলে ইসমাইল বিশ্বাস প্রচণ্ড বড় বক্তা। তাঁর বক্তৃতা শুনলে নাকি পাথরও গলে যায়। নরকের ভয়াবহ বর্ণনায় অনেকেই কাঁদতে থাকে। ইসমাইলেরও 'ভাইরে আমার কি হবে' বলে দাড়ি ভিজে যায়।

বুঢ়বাক নয়া মুসলমানগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি তুলে চোখ মুছতে থাকলে হতবাক ইসমাইল বিশ্বাস বললেন, 'বাবারা বইহা বইয়া কাঁদেন !'

মাঝরাতের আগে 'কিয়াম' (মিলিত প্রার্থনা) শেষ হলে ঈশার নামাজ পড়ার পর নিয়ামত মৌলবীর সঙ্গে আসার সৌজন্যে রমানাথকেও আহারাদির জন্য সমাদর করে রহিম সেখের দরওয়াজায় নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। খানা খেলে সে একই 'খান্টায় (বিরাট ডিস) সম্মানিত মৌলবীদের সঙ্গে পরিষ্কার দস্তরখান'-এর (খানা খাবার আলাদা নকসাদার চাদর) ওপর বসে।

এরপর রমানাথ প্রায়ই নিয়ামত মৌলবীর সঙ্গে যেতে লাগল নানান ধর্মসভায়। একদিন তাকে 'কলেমা' পড়িয়ে মুসলমান করা হল। 'খৎনা' (ত্বকচ্ছেদন) করার পর মাস খানেক সে নিয়ামত মৌলবীর বাড়িতে পড়ে রইল। ঘা শুকিয়ে যেতে লুঙ্গি পীরহান টুপি পরে যখন আয়না গ্রামে নিজেদের বাড়িতে এসে দেখা দিল বাবা আর দুই দাদা যেন হতবাক।

বাবা বামাচরণ বলল, 'তুই মোছলমান হলি ? গরু খেইচিস ?

'হাঁ বাবা।'

'যা বাড়ি থেকে এখুনি বেরো, বেরিয়ে যা দূর হ। তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। ধর্ম খোয়ানো মরণ সমান। তুই মরে গেছিস। তোর আর আমার কাছে জমি-জায়গা, ঘরদোর কিছুই পাওনা নেই।'

বাগদি হলেও বামাচরণের বিঘে তিনেক জমি ছিল।'

মা লক্ষ্মীবালা বলল, 'হাঁ বাবা, তুই শেষবেলা একি কাজ করলি। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? তোকে ছেড়ে কেমন করে পরাণে বাঁচব !'

ঝরঝর করে কাঁদল রমানাথ শুধু। তার নাম এখন হয়ে গেছে ফৈজি সেখ।

বাড়ির কোনো কিছু না নিয়েই আবার ফিরল রমানাথ জোলো-খাঁ কাজীর বাড়িতে। কোন এক আলাউদ্দিন কাজীর যিনি নাকি বংশধর।

তার বাসগৃহের জন্য ভাবনায় জোলো-খাঁ কপালে টোকা মারতে লাগলেন।

মৌলবীর সঙ্গে যুক্তি করলেন। তারপর বললেন, 'সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরীর বাড়ির কাছে আমার কিছুটা পীরোত্তর জায়গা আছে। ওলাবিবির থান ছিল—আয়না গ্রামের আধা-হিন্দু মুসলমানরা করেছিল—কলেরা লাগলে মানত করত ওখানে গিয়ে। এটা 'বেদাৎ' (অবৈধ) কাজ—পৌত্তলিকতারই নামান্তর। ওহাবী আন্দোলনের পর ঘরে-গোলায় সন্ধ্যা দেওয়া, গড় করা, 'ফয়তা' দেওয়া, হিন্দুদের কালীপূজো দুর্গা পূজোয় মানত বন্ধ করা হয়েছে। কবর পূজাও না-জায়েজ (ধর্মসম্মত নয়)। তুমি ওখানে গিয়ে বন কেটে বসত করো। এক বিঘে ডাঙা, পাঁচ কাঠা পুকুর আর দেড় বিঘে ধানী জমি আছে। তোমার নামে আমি পাট্টা বসিয়ে দিলাম।'

রমানাথ ওলাবিবিতলায় এসে অন্য চারজন মুসলমানের সাহায্য নিয়ে ঘর করল। মকর আলী গায়েন পাকা ঘরামি। খড় দিয়ে ঘর ছেয়ে দিল। বাঁশ ছিল একঝাড়। ডোবায় মাছ ও আছে অগাধ। সাপের ভয়ে এখানে প্রায় কেউ এখন আর আসত না। বারোটা চন্দ্র বোড়া আর খরিস কেউটে তিনটে মেরেছে সে। বাগ্‌দির ছেলে, মাছ ধরতে গাছপালা বইতে, হাল লাঙল করতে ওস্তাদ আর সে ভয় করবে সাপকে ?

তয় তয় পিছন থেকে খপ করে মাথাটা ধরে, প্যাঁচ মেরে হাত ভেঙে ফেলার আগেই গামছা জড়িয়ে দিলেই দাঁড়াসের কেরদানী খতম। একবার এই রকম করে বিষহীন দাঁড়াস ধরে এনে স্বর্ণলতার বড়দাদার সামনে ফেলে দিতেই রায় চৌধুরী বাড়িতে চেঁচামেচি বেধে যায়। ভয়ে সবাই পালিয়ে যায়।…

তবে নির্জন মাঠে একা ঘরের মধ্যে শোঁ শোঁ বাতাসে মাঝরাতে কেমন যেন ভয় করে। গৃহ প্রবেশের দিনে খোদ কাজী জোলো খাঁ আর নিয়ামত মৌলবী এলেন।

নিয়ামত মৌলবী বলে গেলেন, 'ভূতের ভয় করবে না। ভূত প্রেত দানো দক্ষিণে সব মিথ্যা। বানানো গল্প। মানুষ মরে গেলে তার আর কোনো ক্ষমতা থাকে না। থাকলে যখন চিতায় লাঠি মেরে মাথা ফাটায় অথবা কবরের ভেতর থেকে শিয়াল ছিঁড়ে খায় তখন সে কিছু করতে পারে না কেন ?

ফৈজী মউ ভাঙে। মাছ ধরে। এক বস্তা চাল পেয়েছিল মুসলমানদের কাছ থেকে খয়রাতি (ভিক্ষা)—তাতে তার বেশ কিছুদিন চলে গেল।

চাষের জন খাটে সে এর তার। পাঁচ আনা মাত্র তার জনের দাম। চালের সের দু-পয়সা ছিল। তখন চার পয়সা হয়ে গেছে। আগে আটটা জন

ছিল টাকায়। আনাজ কিনতে হয় না। চাষীদের বেগুন, কলা, কচু তুলে বাজরা সাজিয়ে হাটে পাঠাবার পর যা 'র‍্যাজ্‌লা' মাল পড়ে থাকে বিলিয়ে দেয়।

মাঘ মাসের শেষ থেকে মাটির দশপাট দেয়াল দিয়ে ঘর তুলে ছাইতে চৈত্র ফুরিয়ে গেল। বৈশাখে সে নতুন ঘর পেয়ে জমিতে মাদা দিয়ে কুমড়ো ঢ্যাঁড়স, পুঁইশাক, লঙকা চাষ করল।

ওলা বিধির থানের ভিটেয় রাতকালে চোর ডাকাত আসতে ভয় করলেও গরু-বাছুরকে জল খাওয়াতে আসতে লাগল অনেকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদভরা দুপুরে। বিরাট খিরিশ গাছটার তলায় ছায়ায় গরু বাছুর বেঁধে দেয়।

স্বর্ণলতাকেও মাঠে গরু-ছাগল বাঁধতে আসতে দেখে ফৈজি সেখ। ওদের বাড়ি আর কেউ রাখাল থাকতে চায় না! রমানাথকে মারার পর সে বিধর্মী হয়ে গেল এই ব্যাপারে জনধনেরা বাবা ঠাকুরকে যেন এড়িয়ে চলে। কাজের কথা বললে সবাই বলে, 'শরীর খারাপ।' নয়তো বলে, 'আগাম টাকা গায়ে নেওয়া আছে নারান মোড়লের—তার কাজে যাব।'

বাবা ঠাকুর স্বয়ং একদিন মাথায় গামছার পাকড় জড়িয়ে গাই গরুকে জল খাওয়াতে এলেন দুপুর বেলা।

ফৈজি সেখ তখন নামাজ পড়ছিল বাইরের দাবায় পশ্চিম মুখো হয়ে। দাড়ি রেখেছে সে। মাথায় কিস্তির টুপি। তবে এখনো বিবি করেনি। জোলো খাঁ কাজী জমি-জায়গা দিলেও মেয়ে দেয় নি। বিরাট খানদানী মানুষ—বিত্তশালী হয়ে কি গরিবকে মেয়ে দেবেন?

সিদ্ধেশ্বর বাবা ঠাকুরের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেতে ফৈজি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বাবা ঠাকুরও কিছু না বলে মুগুর কাঁধে ফেলে চলে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝোড়ো হাওয়া উঠে বাইরের উনুনের কাঠের আগুন ছিটকে বেরিয়ে আসছিল আর মেঘ ডেকে উঠছিল যখন—সারাদিন খাটা-খাটুনির পর বাড়ি এসে ফৈজি সেখ রান্না বসিয়ে যেন বড় মুশকিলে পড়ছিল। আগুনের ফুলকি খড়ের চালে পড়লে আর নিস্তার নেই। অথবা বৃষ্টি নেমে গেলে বাইরের উনুনে আর রান্না করা যাবে না।

'কি রাঁধছ রমাদা? পিছন থেকে স্বর্ণর গলা শুনতে পেয়ে যেন চমকে গেল সে। বলল, 'স্বর্ণ! এমন সময় তুমি এখানে? সাপের ভয় করল না?

'গামছা পরে আমি বাইরে যাবার নাম করে শাড়ি বগলদাবায় লুকিয়ে নিয়ে এসে মাঠের মাঝখানে পরে, তবে আসছি। জানতে পারলে বাবা এবার শিক পুড়িয়ে

পেটের মধ্যে চালান করে দেবে।' বলে হাসতে হাসতে স্বর্ণলতা বসে পড়ল উনুনের কাছে। রান্নার কাজ দেখতে লাগল।

মাত্র বিঘে পনেরো জায়গার ব্যবধান রায়চৌধুরী বাড়ি থেকে। মাঝখানে ধান-জমির মাঠ। সোজাসুজি একটা আল্ পথ আছে। বর্ষাকালে তা ডুবুডুবু হয়ে যায়। ভেড়ি পথের গায়ে কয়েকটি বাবলা গাছ। চারপাশের গ্রামের চাষীদের জমি একশো একরের মতো—মাঝখানে ওলা বিবির থান। গাছপালা ভরা দ্বীপের মতো। উত্তর পাড়ায় থাকে কয়েক ঘর মুসলমান। তারা গরিব। জনটন খাটে মানুষের। উনুনের মুখের আগুন সামলাতে লাগল ফৈজি সেখ সরার আড়াল দিয়ে। তবু জমকে-ওঠা বাতাসে-ছুটে বেরিয়ে পড়তে-যাওয়া-আলোর আভায় স্বর্ণর মুখখানা দেখতে পায় ফৈজি। তাকে যেন কামাখ্যার মন্ত্র-জানা গুণীন বা বেদেনীর মতো রহস্যময়ী দেখায়। বলে, 'এক্ষুণি পালাতে হবে। মা ডাকবে।'

'এভাবে তোমার না আসাই ভাল। এখন আমি আবার একজন বিধর্মী 'যবন' হয়ে গেছি।'

'বেশ করেছ, আমিও হব।'

স্বর্ণর চোখের দিকে তাকিয়ে ফৈজি বলল, 'সত্যি?

'হ্যাঁ। এমন ভাবে থাকার চেয়ে ঢের ভালো। আমিও তো একটা মানুষ।'

স্বর্ণর ঠোঁট দুটো যেন কাঁপছে। সাদা মুক্তোপাতি দাঁতে এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি ঝলকায় মৃদু মন্দ। যেন দূরের মেঘের কোলে হালকা স্ফুরিত বিদ্যুৎ!

'আমাকে তুমি এমন করে দেখছ কেন, রমাদা?'

'আমি তো আর রমানাথ নেই ফৈজি সেখ।'

হঠাৎ হি হি করে হাসল স্বর্ণ। বললে, ফৈজি সেখ! দাড়ি রেখেছ! আর···'তবে তোমাকে একটা মোছলমানীও দিল না কেন?'

'দিতে চায় রহিম সেখের মেয়েকে—আমি বিয়ে করতে চাইনি।'

শোঁ শোঁ শব্দ ছুটে আসছিল। ঝড় উঠল এবার হাঁড়ি-কুঁড়ি তুলে দিল স্বর্ণ। ঝড়ের দাপটে গাছপালা দুলতে লাগল। স্বর্ণকে এবার যেতেই হবে। খোঁজা খুঁজি পড়ে যাবে। জানালা কপাট বন্ধ করবে কে? কাপড়-চোপড় জ্বালানী-কাঠ তুলবে সে। উঠোনে মেলা আছে সরষে, তিল, অড়হর খেসারি, মটর কলাই, ধনে—সেসব বৃষ্টিতে ভিজলে বাবা মা খুব মারবেন।

হঠাৎ স্বর্ণ ফৈজি সেখের একটা হাত দু-হাতে চেপে ধরল। দরদী গলায় বলল, যাই আমি—এ্যাঁ?

ঝড় ওঠা সন্ধ্যার পর যখন স্বর্ণ চলে যাবে—অনেক কষ্টে—বিপদ মাথায় নিয়েও তখন রমানাথের নীরবতা বিরক্তিকর আর বোকামীর লক্ষণ মনে করে ক্ষ্যাপার মতো জড়িয়ে ধরল ওকে স্বর্ণ।

স্বর্ণর নরম বুকের চাপ রমানাথের বুকে। সে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'স্বর্ণ!'

স্বর্ণ বলে ওঠে, 'আমি তোমার। তুমি আর কোনো মেয়েকে বিয়ে কোরো না।'

'তোমার বিপদ হবে।'

'হোক।'

'ধরে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

'আমিও আগুন ধরিয়ে দোব। যাই আমি'। স্বর্ণ ক্ষ্যাপা ঝড়ের মতোই চোখে-মুখে-কপালে চুমো খেতে লাগলো। তারপর ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে নেমে ছুটে চলল। ওকি সত্যিই ডাকিনী হয়ে গেছে?

বিদ্যুৎ চমকালে স্বর্ণকে দু-একবার দেখা গেল।

বৃষ্টি নামল এবার মুষলধারে।

স্বর্ণ নারকোল আর পাতা নিয়ে গিয়ে ভিজে শরীরে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই তার মা সরমা দেবী হাতে বাঁখারি নাচিয়ে বললেন, 'কোথা গেছিলি তুই এতক্ষণ?'

'বাইরে গেলুম তো! পেট কনাচ্ছে। আমাশা হয়েছে।'

'হারামজাদী। মিথ্যে কথা!' পিঠের ওপর জোরে বাঁখারির বাড়ি সাঁটালেন সরমা দেবী। বললেন, মেয়ের ভয় বলে কিছু নেই! ডাকাতে কালী যেন! এই ঝড়জলের আঁধারে বাগানে গেছে? পেটের জ্বালায় ঝড় উঠলেই নারকেল কুড়োতে ছুটে আসে কত ছোঁড়া! মরবি বলে লেগেছিস? এই 'আশ্‌লার দিনে' আঁধার রাতে সাপেও কাটে না তোকে? ধনে-কড়াই-তিল-সরষে সব ভিজে গেল!'

স্বর্ণ ফুঁসিয়ে উঠল, 'কেন, আমি কি দাসী আছি?' যে চারটে দাসী করে এনেছ তারা শুধু পটের বিবি হয়ে শুয়ে বসে থাকবে?'

'হাঁ, তুই দাসীই তো! বউরা সুখভোগ করতে এসেছে সংসারে। বড়লোকের মেয়ে সবাই।

মা চলে গেলেন। স্বর্ণ ভিজে গামছা ছেড়ে কাপড় পরে রান্নাঘরে গিয়ে বসে রইল।

মা ধমক দিলেন, 'ভাত হয়ে গেছে, ফ্যান গড়াবি না বোড়া সাপের মতো বসে বসে ফুলবি?'

ফ্যান গড়াতে বসল স্বর্ণ। ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা আমিষ হেঁসেলে ঢুকলে নাইতে হয়। তা হলেও স্বর্ণকে রোজই দুবেলাই এ কাজের ভার নিতে হয় আজকাল। মা তরকারী রান্না করেন। চার পাঁচটা তরকারী না হলে কারো খেয়ে জুত হয় না।

বড়বউ রান্না করত, এখন তার আবার মা হবার সময় এসে গেছে। মেজোবউ গেছে বাপের বাড়ি। সেজোবউ হাজার সবকিছু জ্বলে-পুড়ে গেলেও দেখে না। সাজ-গোজ করে। গহনা পরে। দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে পড়ায়। গান গায়। দোতলার ঘর থেকে প্রায় নামেই না। ছোটবউ নতুন। তাকে ফাই-ফরমাস খাটান না। বালিকা বধু। মায়ের পা-হাত টিপে দেয়। গল্প শোনে। পান সেজে দেয়।

স্বর্ণ রাত্রে নিজের ঘরে বসে আয়নায় মুখ দেখে। হাসে। জিভ বার করে। তাকে কি সত্যিই কালী ঠাকুরের মতো দেখায়? সে তো ফর্সা!

হিন্দুধর্মের নিয়ম কানুন বড় নিষ্ঠুর—স্বর্ণলতা ভাবছিল। যে বাপ-মা আদর করে মাথা খেয়ে মানুষ করলে চিতায় তুলে তাঁদের মুখেই আগুন দেয় ছেলে।

স্বর্ণর ঘরে শ্রীকৃষ্ণের পট আছে। সে আলো তুলে ধরে তাঁর মুখটা দেখে। কত কথা জিজ্ঞেস করে। কোনো উত্তর নেই। দেবতার আবির্ভাব হয় এগুলো কি বানানো? স্বর্ণ বেশি কিছু আর ভাবতে পারে না। ভবিষ্যৎ তার অন্ধকারে ঢাকা।

মাসখানেক আগে নিমু ঘোষ মারা যাবার আগেই তার ছেলেরা তাকে তুলসীতলায় নামিয়ে দিয়ে এলো। নিমু ঘোষ খুব কৃপণ লোক ছিল। বন্ধকী ব্যবসা চালাত। তার বুড়ি চাবির গোছা আগেই হাতিয়ে নিয়ে নাই-কোঁচড়ের গিঁটে বেঁধে রেখে কৃত্রিম শোকে মনসাতলায় উপুড় হয়ে পড়ে তখন মূর্ছিতা। ছেলেরা

মাকে ডাকে। সান্ত্বনা দেয়। বুড়োর গালে গঙ্গাজল দেয় আর হরি নাম করতে বলে পাশের বাড়ির এক বুড়ো।

নিমু বুড়ো মারা যাবার আগেই তাকে চেপে বেঁধে ফেলে খাটুলিতে তুলে হরিধ্বনি দেওয়া হয়। তার বিছানা পত্র শ্মশানে ফেলে দেওয়া হয়।

শ্মশান থেকে তার চার ব্যাটা বাড়ি ফিরেই কি মারামারি। জিনিসপত্রের সমান বখরা চায় সবাই। বড়ভাইটা খুন হয়ে গেল!

স্বর্ণলতা ভাবে বন্ধকের জিনিস আর জমি-জায়গার ওপরে মানুষের মনের দুঃখ-মায়া-মমতা থাকে—তার অভিশাপ লাগবে না?

নিমু ঘোষ নাকি চিতার ওপর খ্যান পেয়ে ঝেড়ে-মেড়ে উঠে বসেছিল!

'সোনা রূপো টাকা-পয়সার কথা মনে পড়েছে!' বলে নাকি মাতাল দাহকারীরা খুব সোটায়।

নিমু ঘোষের শরীরে চর্বি বলে বলে কিছু ছিল না। কৃপণ লোক কিছু খেত না। স্নায়ুশিরায় আগুন লেগে টান পড়ার পর সে তো বেঁকে-চুরে ঝেড়ে-মেড়ে উঠতেই পারে।—একথা সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরীর।—'খ্যান-পাওয়া বা ভূত হওয়া মিথ্যা ব্যাপার! তবে সাধারণ লোককে সব সত্য ব্যাপার বলতে নেই।'

যখন রাত নিশুতি—শিয়াল ডাকছে দূরের মাঠে—প্যাঁচা ডাকছে বাঁশবাগানে—স্বর্ণর মনে হয় কোনো একটা অশরীরী আত্মা যেন তাকে বলে, 'এই স্বর্ণ, ওঠ—খিড়কির দোর খুলে পালিয়ে যা রমানাথের কাছে। সে তোকে জীবনের মর্যাদা দেবে—সুখ দেবে!…'

আর একটা আত্মা যেন ধমক দেয়, ভয় দেখায়। বলে, 'খবরদার যাবি না। দোর খুলে রেখে গেলে চোর ডাকাত ঢুকে যদি বাবার সংসারের সর্বনাশ করে? যদি বাবাকে সোনা আর টাকার লোভে কেটে ফেলে? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঝুঁটিমার্কা টাকা আছে বাবার গাছ-সিন্দুকের মধ্যে অনেক। সোনা আছে সের পাঁচেকের কম নয়। যদি তোমাকে সাপে কাটে? কেউ যদি দেখে ফেলে?'

নিমু ঘোষের বড় ছেলেটা মাতাল। তাড়ি খেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইত। শহরের মিষ্টির দোকানে ছানা দিয়ে ফেরার পথে সে চেঁচাত। একবার মাঠের কোলে সেই অজয় ঘোষ বলে, 'স্বর্ণ, তোমার শরীর যেন আগুনের মালসা!'

'পুড়ে মরতে সাধ যায়?'

'হ্যাঁ।'

'পাপবোধ নেই?'

'একটাই যখন জীবন। জন্মান্তরে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার অবিশ্বাসে তো ধর্ম লোপ পেয়ে যাচ্ছে না। সাবধান করে দিচ্ছি, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়িয়ো না। বাবাকে জানিয়ে দেবো। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে।'

'আগুনের মালসা!'

'হাঁ তাই।'

রাগে স্বর্ণলতা গরুর খোঁটা মেরে দেয় অজয়ের কাঁধের ওপর। তবুও নেশাগ্রস্ত অজয় হাত বাড়াতে গেলে গরু ছেড়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসে বাগানে উঠে পড়ে। বড় রকম একটা অনর্থ বাধার ভয়ে অজয়ও ক'দিন পালিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু স্বর্ণ তার কথা কাউকে কিছুই বলেনি। মেয়েদের নাকি বলতে নেই। পাঁচকান হয়ে গেলে তারই বদনাম রটে। কারণ তোমার প্রকট রূপ-যৌবনই অনর্থের জন্যে আসল দায়ী।···

বিবেক আর শনির লড়াই থেমে যায়—কখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বর্ণলতা। সকালে উঠে দেখে রোদে হাসছে গাছপালা।

ফৈজি সেখের ঘরের মটকা দেখা যাচ্ছে।

[৩]

ঘোড়ায় চড়ে জোলো-খাঁ কাজী থানা থেকে ফেরার পথে সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পরস্পরে দাঁড়ালেন।

বাবাঠাকুর নমস্কার জানালেন। কেননা তাঁর বাপ-ঠাকুরদাদারা নায়েবের কাজ করেছেন কাজী বংশের। গোটা দক্ষিণ বঙ্গের মনসবদার ছিলেন জোলো খাঁর পিতামহ শরীফুল কাজী। তিনি বাহাদুর শাহের দরবারে যেতেন। খেতাব পেয়েছেন। কাঠ-কয়লা-পোড়া ইটে চুন-সুরকির গাঁথুনিতে খিলেন-করা দোতলা বাড়ির নিচের গড়ে তাঁর সৈন্য থাকত। এখনো অবশ্য কয়েকজন পাহারাদার থাকে।

জোলো-খাঁ কাজী বললেন, 'কি খবর চৌধুরী মশাই?'

রায়চৌধুরী বললেন, 'রামমোহন ইংরেজি শিখে হিন্দুদের ইংরেজের গোলাম বানালেন। সুযোগ সুবিধের লোভে অনেক হিন্দু খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। আগে যেমন 'যবন' হয়ে যাচ্ছিল।

'যবন' মানে কিন্তু গ্রীক। মুসলমানদের আপনারা 'যবন' বলছেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপরে বর্ণহিন্দুরাও তো কম অত্যাচার করে না। যাকগে, ওসব কথা। আপনি থানার বড় দারোগার কাছে বন্দুক চেয়ে দরখাস্ত করেছেন?

—'দারোগা বলেছেন?'

'বলবেনই তো। একই সম্প্রদায়ের লোক।'

রায়চৌধুরী যেন ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ইংরেজভক্তি তাঁর প্রকাশ পেয়ে গেল। তাই বলেও ফেললেন, 'ইংরেজ না হলে আমাদের আর পরিত্রাণ নেই।'

'কিন্তু মুসলমানরা তাঁদের এখনো ভাল মনে স্বীকার করে নেয়নি। নবাব সিরাজদ্দৌলা, নবাব ওয়াজেদ আলী, নবাব টিপু সুলতানকে যেভাবে ইংরেজরা গ্রাস করে সাম্রাজ্য বিস্তার করল তা যেমন বেআইনী তেমনি অমানবিক। সভ্য জাতির পরিচয় নয় এটা। বেনের বাচ্চারা ব্যবসা করতে এসে আমাদের পায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর-উমিচাঁদ-জগৎ শেঠের সাহায্য নিয়ে লোভে পাগল হয়ে সিংহাসনে চড়ে বসল। হিন্দুরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছে। চৌধুরী মশাই, আপনি বন্দুক পাবেন। আমি আপনাকে দিতে বলেছি। তবে মানুষ হত্যা করবেন না। দরিদ্র অচ্ছুত লোকদের নাকি আপনি ঘৃণা করেন। মারধর করেন। এসব করবেন না। এতে তো হিন্দুদেরই ক্ষতি হবে।'

জোলো-খাঁ কাজী ঘোড়া টগবগিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রোদে তাঁর শরীর এখনো চকচক করে। গাল লাল হয়ে ওঠে।

'জয় মা কালী! জয় মা দুর্গা!' বললেন রায়চৌধুরী। তিনি থলেয় করে একশো টাকা ঘুষ দিতে চলেছেন থানাতে। বড় দারোগাবাবু আবদুর রহিম খান সেই টাকা নিজে বোধহয় নেবেন না, ডি এস পি ক্যানিংহ্যামকে দেবেন। আজ তিনি আসার কথা সাহেবান বাগিচা, কামরা অঞ্চলের নীলকুঠির সাহেব ফালমনের কাছে।...

যেদিন বন্দুক আনলেন সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী ঠিক সেইদিন মাঝরাতে হঠাৎ ডাকাত-পড়া বা ঘরে আগুন লাগার মতো হো-হো—হো-হো চীৎকারে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল।

সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী জেগে উঠে আলোয় জোর দিলেন। বন্দুক হাতে তুলে নিলেন। সরমা দেবী ছেলেদের ডেকে তুললেন।

কিন্তু খিড়কির দোর খোলা কেন?

সরমা দেবী দেখলেন স্বর্ণলতার ঘর খোলা। সে নেই।...

ওলাবিবির থানের দিকেই হো হো শব্দটা হচ্ছিল। দোতলার বারান্দায় এসে জুটলেন সকলে।

মশাল জ্বলছে ফৈজি সেখের বাড়িটার উত্তরে আর দক্ষিণে। তর্ক-ঝগড়া হচ্ছে যেন দু-দলের মধ্যে।

'স্বর্ণ কোথায়?' রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন।

সরমা দেবী বললেন, 'ঘরে নেই তো! পাজী মেয়েটা আমাদের মানকুল সব ডোবালে!'

বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলেন সিদ্ধেশ্বর। ছেলেদের বললেন, 'মশাল জ্বাল্—চল্ তো দেখি!'

সরমা দেবী যেন আতঙ্কিত হলেন।

বড় ছেলে দীপঙ্কর বলল, 'বাবা, তুমি একদম মাথা গরম কোরো না। সেদিন রমানাথকে মারা তোমার উচিত হয়নি।'

মশাল নিয়ে দুই ছেলেকে সঙ্গে করে বন্দুক হাতে সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী মাঠ পার হয়ে এসে দেখলেন দশ-বারোজন ঘোষ-খাঁড়া-মালিক-হালদার প্রভৃতি হিন্দুরা একদিকে, আর অন্যদিকে একদল মুসলমান। তাদের একজন বলল, 'তোমাদের মেয়ে আসে কেন?'

হিন্দুদের একজন বলল, 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছ? ভারত কাদের? হিন্দুদের নয়? তাদের মেয়ে ফুঁসলে নিলে মা-কালীর মন্দিরে বলি দোব আমরা।'

সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী দু-দলকেই শান্ত হতে বলে রমানাথ ওরফে ফৈজি সেখকে ডাকলেন। সে বেরিয়ে এলে বললেন, 'তোমার ঘরের মধ্যে স্বর্ণলতা আছে?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'ডাকো তাকে।'

স্বর্ণ এসে দাঁড়াল। তার মুখে চোখে অসামান্য এক দৃঢ়তা। ঘাম চকচক করছে।

'স্বর্ণ, তুমি কি স্ব-ইচ্ছায় এখানে এসে উঠেছ, না রমানাথ তোমাকে জোর করে ধরে এনেছে?'

'আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি।'

'তুমি এখন সাবালিকা। জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। বাবার মুখ তুমি চাইলে না?'

স্বর্ণ নীরব রইল। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'হিন্দুধর্মে আমার জন্য ভবিষ্যৎ সুখের কিছু আছে কি? মানুষের সুখশান্তি মঙ্গলের জন্যই তো ধর্ম।...'

'থাক থাক, তোমার মতো একটা অসতী মেয়ের কাছে আমরা ধর্মের ন্যায় নীতি শিখতে আসিনি। আসল কথা বলো, তুমি কি ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমানের কাছে জাত দেবে?'

'মেয়েদের আবার জাত কিসের? তারা তো জলের মতো, যে পাত্রে থাকে তারই আকার ধরে।' 'আমাকে কেউ জোর করেনি—আমি নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি।'

'যদি হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে যায়?'

'হিন্দুরা আমাকে নিয়ে কোন সিংহাসনে বসিয়ে রাখবে? আমি বাড়ির দাসী হয়ে থাকতে চাইনা। আমিও মুসলমান হব।'

'এই শালা রমানাথকে গুলি করে মেরে ফেলুন বাবাঠাকুর। শালা বিশ্বাসঘাতক।' একজন বলল। অপর পক্ষের একজন বলল, 'রমানাথ তো এখন ফৈজি সেখ! তাকে মেরে ফেললে হাজার মুসলমান ছুটে আসবে এখানে! সে এখন একা নয়।'

সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী থানার বড়বাবু আবদুর রহিম, জোলো-খাঁ কাজী, ইমাম নিয়ামত হোসেনের কথা ভাবলেন।

দীপঙ্কর বলল, 'চলো বাবা, ঝাড়ের বাঁশ ঝাড় থেকে বেরিয়ে গেছে—তার দাবি করে রক্তপাত ঘটানো মূর্খের কাজ। হিন্দুদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খেয়ে মুসলমানগুলো বাঁচুক। বাঘ-সিংহ কারো উচ্ছিষ্ট খায় না—খায় শিয়াল-কুকুরে।'

স্বর্ণলতার মেজো ভাই শুভঙ্কর বলল, 'আগে জানলে ঐ বোনকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম আমি। ছি ছি, তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরলি না কেন?'

স্বর্ণ কি যেন বলতে যাচ্ছিল ফৈজি হাত তুলে নিষেধ করল।

হিন্দুদের চলে যেতে ইশারা করে যখন সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী এগোচ্ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'ঠাকুরমশাই, তাহলে হুকুম দিয়ে গেলেন তো?'

* * *

পরের দিন সকালে নাজান গ্রাম থেকে অনেক মুসলমান এসে হাজির হল। সবাই চাঁদা দিল। খানা খাবার জিনিসপত্র এলো। দেগ হাঁড়ি চড়ল। নিয়ামত হোসেন অন্য সব মৌলবীদের নিয়ে এসে আলোচনা করতে লাগলেন।

মুসলিম মেয়েরা এসে বিয়ের কনের শৃঙ্গারের কাজ শুরু করল। স্বর্ণকে হলুদ মাখাল। হাতে লাল কার বেঁধে দিল। স্নান করিয়ে নতুন শাড়ি পরাল। ঘোড়ায় চড়ে দুপুর বেলা খানা খেতে এলেন জোলো খাঁ কাজী। তিনি কন্যার পক্ষ হয়ে কিছু সোনা-রুপোর গহনা দিলেন।

আসরের নামাজের আগে সাদি পড়ানো শেষ করলেন ইমাম নিয়ামত হোসেন।

সুখের সংসার পাতার জন্যে সমস্ত মুসলমান হাত তুলে আল্লার কাছে প্রার্থনা করল।

স্বর্ণলতার নাম পালটে গেল।

ফৈজি সেখ শুধালে তার চিবুক ধরে, কি নাম তোমার গো এখন?

'আস্‌মা খাতুন।' লজ্জাভরা হাসি আজ স্বর্ণলতার চোখে।

[৪]

যেখানে ছিল পতিত, ভাগাড়, মলঙ্গ, নোনাপোড়ে, খালধার সেসব জায়গায় বসে গেল নবদীক্ষিত মুসলমানেরা কুঁড়ে ঝোপড়া বেঁধে। জোতদার হিন্দুরা তাদের কাজ দিতেন না—তাই খালবিল জলাশয় নদী থেকে মাছ শিকার করে, বন জঙ্গল থেকে মউ ভেঙে, মাঠের ঝরে পড়া ধান আর গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে করে বেচে দিয়ে দিন চালাত তারা। নিম্ন শ্রেণীর বাগদি-তিয়োর-ডোম-মুচি-মেথর-জমাদার থেকে কিছু লোক বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার আর অবহেলায় ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হল বটে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক সমাধানের কোনো রকম ব্যবস্থা করা হল না। বড় জোর তারা কোনো কোনো বিত্তবান মুসলমানের পীরোত্তর

বা লাখেরাজ সম্পত্তির কিছু অংশ দয়ার দান রূপে পেয়ে ভূঁই কুঁড়ে বেঁধে থাকল। রাজ্য হারা হবার পর বিত্তবানদের ছেলেরা মাদ্রাসার খানিকটা পঠন-পাঠনে আরবী-উর্দু-ফারসী শিখল বটে কিন্তু তা দিয়ে আর অর্থনৈতিক সমাধান হল না তেমন কিছু। আধুনিক শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল বটে কিন্তু খ্রীস্টান বিদ্বেষে আর রাজ্যগ্রাসী শত্রু ইংরেজদের ওপর বিরূপ মনোভাবের জন্য তারা সেখানের বিদ্যা গ্রহণ করতে গেল না। মৌলবীরা জানালেন, ইংরেজি শিক্ষা হারাম। সে শিক্ষা মানুষকে শয়তান করে দেয়। ইংরেজরা ইংরেজি শিখিয়ে গোলাম বানাবে।...

পীরোত্তর বা লাখেরাজ সম্পত্তির অংশ ভাগ হয়ে চার বিবির বহু সন্তানের দখলদারীতে তা মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেন জালা ভেঙে খোলা হয়ে গেল।

ফৈজি সেখ রোজ নিয়ামত হোসেনের কাছে গিয়ে গিয়ে আরবী কেতাব কায়দা পড়া শিখল। দেড় বিঘে জমিতে তার প্রায় মণ বারো ধান হয়—দুজনের খোরাকী চলে যায়। এক ফসলী আমন ধান ছাড়াও সে কুমড়ো লঙ্কা, খেসারি আর অড়হর চাষ করে। কলাগাছ লাগাবার পর ফলন শুরু হয়েছে। বাঁশ বসিয়েছে দু ঝাড়। বাস্তু ডাঙা তেড়ে কুপিয়ে সুপারি আর নারকেল চারা বসিয়েছে চার ধার দিয়ে। ভাল জাতের কাঁক্‌নি গাছের সুপারি আর নারকেল চেয়ে এনেছিল সে জোলো খাঁ কাজীর কাছ থেকে। 'হাপর' দিয়ে রাখার পর চারা হতে চেলে লাগানোর দু-বছর পরে তুলে লাগিয়ে দিতেই পড়ো সার মাটিতে জোর ধরে সতেজভাবে বেড়ে উঠছে।

বর্ষায় মাঠ ঘাট যখন ডুবে যায় তার ভিটেটার অবস্থা যেন একটা দ্বীপের মতো হয়ে যায়। যে ভেড়ি দিয়ে রায়চৌধুরী বাড়ির দিকে বা হিন্দু পাড়ায় যাওয়া যেত তা কাঁটা বেড়া সাঁটার ফলে সেদিকে আর যায় না তারা। উত্তর দিকের ভেড়ি আর বাগের ডাঙা দিয়ে পথ চলে। সাপখোপের ভয় ছিল আগে খুব। মানুষ চলাচলের পর তা অনেকটা নির্বিঘ্ন হয়ে যায়! বনঝোপ সব পরিষ্কার করে ফেলেছে ফৈজি। বাঁশের শুকনো 'মুড়ো' তুলেছে সে গরুর গাড়ির তিনগাড়ি। সারা বছরের জ্বালানী হয়ে যাবে।

পিঁপড়ের চাক ভেঙে ছিপ ফেলে ডোবা থেকে কই মাগুর, শিঙি, শোল, ল্যাটামাছ ধরে ম্যাচলায় জীইয়ে রেখেছে সে।

ফৈজির এখন তেমন কিছুর অনটন নেই। আর আসমা খাতুন লক্ষ্মীগিন্নি

তার। ঘরদোর লেপেপুঁছে নিকিয়ে যেন তকতকে করে রেখেছে। ওপাড়ার মুসলমান মেয়েরা এসে গল্প করতে করতে পান খেয়ে চরাৎ করে উঠোনে পিক ফেললেই আস্‌মা খাতুন রাগ করে বলে, 'হালিমার মায়ের এই একটা রোগ —যেখানে-সেখানে পানের পিক্‌ ফেলে নোংরা করবে। মুসলমানদের বিনা 'ওজু'তে থাকা যখন নিষেধ তখন নোংরা করবে কেন ঘরদোর?

সঙ্গে সঙ্গে নিকিয়ে দেয় জায়গাটা। কিন্তু হালিমার মায়ের রুচিহীন ঐ এক প্রশ্ন, 'দু-বছর গুজরে গেল তবু তোমাদের বাচ্চা হল না কেন? পুরুষটা কি তোমার 'মওগা' (হিজড়ে)?'

আসমা বলে, পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

'তোমার জানে সইবে?

আলিমদ্দির বউ বলে ওঠে, 'মেয়েমানুষ সব যন্ত্রনা' সইবে লো বুন, ঐ মদ্দ মানুষেয় বখরা দিতে তার কোল্‌জে ফেটে যাবে!'

স্বর্ণ বলে, 'যাদের তিন-চারটে সতীন থাকে?'

'ওলো বুন, তাদের তাদের সংসারে শান্তি নেই। আগুন জ্বলে রাতদিন।'

তাহলে এ নিয়ম করল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারল না।

সন্ধ্যায় রাঁধাবাড়া শেষ করে হাঁড়ি-কুড়ি তুলে নেবার সময় মাটির মসজিদ থেকে খাঁ-পাড়ায় আজান হতে শুনলে 'ওজু' করে নিয়ে ফৈজি সেখ নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যায়। নামাজ শেষে ফৈজি লণ্ঠনের আলোয় কোরআন শরীফ পড়তে বসে। সুর করে দুলে দুলে পড়ে সে। 'কাসাসল্‌ আম্বিয়া' (নবী কাহিনী) নামের বিরাট আকারের চওড়া আর উঁচু একখানা বাংলা পুঁথি এনেছে সে—ফি শুক্রবার সন্ধ্যায় যখন সাপ খেলানো সুরে উচ্চৈস্বরে পড়ে শোনায় আয়মা, বাঁশবেড়িয়া সাতগাছিয়া নোদাখালীর কয়েকজন মুসলমান এসে বসে মন দিয়ে শোনে।

প্রতি জুম্মাবারের দুপুরে সবাই নামাজ পড়তে যায় জোলো খাঁ কাজীর মসজিদে। নামাজের পর সবাইকে নিয়ে জলসা হয়। মসজিদের মধ্যে বাইরের কোনো রকম হাল গল্প করা নিষেধ।

রাজনৈতিক সংকটের সময় মসজিদই মুসমানদের জন্য নিরাপদ ঠাঁই'-একথায় নিয়ামত হোসেন রাগ করে বলেন, 'গাঁজায় কি দোক্তা কম হয়েছে? মসজিদে

আল্লা-রসুলের চিন্তা ছাড়া কোনো সাংসারিক সমস্যার কথা বলা চলে না। সে আলোচনা যদি খুব জরুরী হয় তবে মসজিদের বাইরের আঙিনায় বসে করো গিয়ে।

অবসর সময়ে নিয়ামত মৌলবীকে ফৈজি সেখ শুধোলে, 'মেয়েরা সতীন সহ্য করতে পারে না, অথচ ইসলামে চারবিবি পর্যন্ত 'হালাল বা বৈধ—এটা কি রকম ব্যাপার?'

নিয়ামত বললেন, 'বদর আর অহোদ যুদ্ধের পর মুসলমান পুরুষ অনেকেই শহীদ হয়ে যান। তাদের বিধবা আর বাচ্চাদের লালন-পালনের সমস্যা দেখা দেয়। তখন হুজুর আক্‌রাম আল্লার রসুল হজরত মোহম্মদ 'সাল্লে আলায়ে আলায়হে সাল্লাম' (তাঁর উপরে আল্লার করুণা বর্ষিত হোক) একাধিক বিবাহে সম্মতি দেন। অবশ্য বিত্তবান পুরুষদেরই। যাঁরা একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। অন্যথায় নয়। বউ করে খাবার পরবার দিতে পারব না এমন বিধান ইসলাম দেয়নি। তাদের ওপর নির্যাতন বা তাদের ইচ্ছা-মতো তালাক দেওয়াও উচিত নয়। তালাক জায়েজ বা বিধিসম্মত হলেও তা দিলে আল্লার 'আরশ' বা সিংহাসন কেঁপে যায়—তালাক দেওয়ারও নিয়ম-নীতি আছে। একেবারে ঘরকন্না যদি নাই হয় তবে লোকজন বসে তিনবারে ঠাণ্ডা মাথায় তালাক কলুব করিয়ে বিয়ের ক্ষতিপূরণ দেনমোহর দিতে হবে—যাতে ঐ মেয়েটির আবার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। ইসলামের মূল লক্ষ্য মুসলমানের সংখ্যা বাড়ুক আর দ্রুতহারে তা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। যুদ্ধে হারানো পুরুষদের তারা বহু বিবাহের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। তবে সক্ষম বিত্তবান ব্যক্তিও চারটের বেশি বিয়ে করতে পারবেন না। আর সতীনদের মধ্যে যাতে অশান্তিকর ঝগড়া ফাসাদ না হয় তাও তাঁকে সামলাতে হবে।'

ফৈজি শুধোয়, 'যদি আমি বিত্তবান হই আর একটা মাত্র বউ নিয়ে সংসার জীবন শেষ করি তাতে 'গোনাহ' বা পাপ হবে কি?'

'না। যদি তোমার ঐ বউয়ের গর্ভে সন্তানাদি আদৌ না হয় তবে স্ত্রীর মত নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, বংশ রক্ষার জন্য।'

আসমার প্রশ্নের উত্তরে ফৈজি সেখ এবার সব বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু আসমার মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তার ওপরে কি জীনের আসর হল এই নির্জন জায়গায়—যাতে

তার এমন ভাল চেহারাতেও সন্তান এলো না দু-বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও। তার তো কোনো রকম রোগ নেই।

মুসলমান মেয়েদের কথায় তাবিজ কবচ ধারণ করল আস্‌মা কিন্তু আরো এক বছর কেটে গেল সে মা হতে পারল না। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে—তাই গোপনে বাবা বড়-কাছারী বা শিবের পূজো মানসিক করল মনে মনে। আসলে পুরুষটাই তার তেমন নয়। কেবল ধর্মের আর জমি-জায়গার, ফসলের চিন্তা।

ঈশার নামাজ শেষ করে রাত এগারটার সময় যখন শুতে এলো ফৈজি সেখ বাঁশের মাচানের বিছানার ওপর তাকে আস্‌মা শুধোলো, 'হ্যাঁ গা, তুমি কি রকম লোক বলোতো? তুমি আর একটা মেয়ে বিয়ে করবে?

'কেন?'

'জানি' আমি।

'এসব মিথ্যে ধারণা। সময় মতো ঈশ্বর ঠিকই তোমার সন্তানাদি দেবেন। উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। তোমার আমার বয়স কি পার হয়ে যাচ্ছে?'

'বুড়ো বয়সের ছেলে, মানুষ হবে কবে?'

ফৈজি সেখ দোয়া-দরুদ পড়ে আস্‌মা খাতুনের গা-মাথায় ফুঁক দেয়।

'তুমি আগেও যেমন ছিলে এখনো তেমনি আছ। দেখ, যখন তুমি রমানাথ ছিলে আর আমি ছিলাম স্বর্ণলতা, তখন আমি যে রকম সুযোগ-সুবিধে তোমাকে দিতাম, খারাপ চরিত্রের ছেলে হলে কবেই আমাকে নষ্ট করতে পারতে।'

ফৈজি বলে, 'আমার গোড়া থেকেই ওসব প্রবৃত্তি নেই।' আল্লা তোমার শরীরে যৌবন যেন ঢেলে দিয়েছে আস্‌মা।…এমন চেহারা হাজারটা মেয়ের মধ্যে একজনের হয়তো মেলে। তোমার নাক-চোখ-ঠোঁট-চুলও খুব সুন্দর।'

'তোমার দাড়িগুলোয় আমার সুড়সুড়ি লাগে।'

পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায়।

এক সময় ক্লান্ত ফৈজি ঘুমিয়ে পড়ে। আস্‌মার চোখেও ঘুম নেমে আসে।

স্বর্ণর আশা পূর্ণ হয়। সে মা হয় আরো এক বছর পরে। বেশ সুন্দর দেখতে তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মায়।

ধীরে ধীরে সে বড় হতে থাকে। সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী মাঠে গরুকে জল খাওয়াতে এসে দেখতে পায় স্বর্ণর ছেলেকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খর তাপে যখন ছোটছোট খানা ডোবার জল শুকিয়ে যায়, অপেক্ষাকৃত বড় পুকুরের হাঁটু পরিমাণ জল তুষিত হয়ে কলেরা-বসন্ত রোগ দেখা দেয় নোংরা পল্লীগুলোর মধ্যে তখনো সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরীর বাগানের বিশাল পুষ্করিণীতে দশ-বারো হাত জল থাকে— আর সে পুকুর থেকে চান করে কাউকে জল পর্যন্ত আনতে দেন না। মুসলমানদের তো নয়ই। তবে তারা যায় রাত্রে—গোপনে—সারি বেঁধে—অন্ধকারে।

একদিন বন্দুক হাতে আলো নিয়ে এসে হাজির হলেন শানের ঘাটে স্বয়ং সিদ্ধেশ্বর। হাঁক মারলেন, 'কারা সব এখানে? গুলি করে মারব।' বন্দুক ওঁচালেন তিনি। দেখলেন স্বর্ণলতা স্নান করে উঠে আসছে কাঁখে জলভরা কলসী নিয়ে। পিছনে বাচ্চা বুকে রমানাথ সরদার। তবে এখন ওরা আস্‌মা খাতুন আর ফৈজি সেখ!

বন্দুক নামিয়ে নিলেন সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী। আলোও নিভিয়ে দিলেন। বললেন, যাও তোমরা—সবাই স্নান করে—জল নিয়ে—কিন্তু কেউ দিনের বেলা এসো না।'

বাবা ঠাকুর শানের রকেই বসে রইলেন। প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন মেয়ে পুরুষ একে একে স্নান সেরে জল তুলে নিয়ে মাঠ পার হয়ে চলে গেলো।

[৫]

এর বছর সাতেক পরে যখন সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরীর মাথার চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে আর স্বর্ণর ছেলে ফতেহার এসে বাগানের পড়ে থাকা পেয়ারা, আম জামরুলের খোঁজ করে একদিন তাকে ধরে ফেলেন।

'কে তুই, নাম কি তোর?'

'আমি ফতেহার।'

তুই শালা 'নেড়ে'! হিন্দু মা আর মোছলমান বাপের জন্ম তুই। জানিস আমি কে?'

তুমি—তুমি তো আমার দাদু!'

'ওরে শালা! সব খবর রাখো? তা কুড়ানো ফল খেতে আছে? সাপ, মাকড়সা মুখ দেয়। বাদুড়ে খায়। তুমি গাছে চড়া শিখেছ?'

'না, মা মারে গাছে চড়তে গেলে।'

'তাহলে পেয়ারা পাড়বি কি করে?'

'খুব পেকে আছে দাদু—বড় বড—এই নিচু গাছটায়।'

'আয় পাড় তবে, আমার কাঁধে ওঠ।'

ফতেহারকে কাঁধে তুলতে গিয়ে তার ঠ্যাংয়ে পৈতে জড়িয়ে গেল, দেখলেন, ছেলেটার বেশ ওজন আছে, কাঁধের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে সে এক হাতে ডাল ধরে থেকে পটাপট বড়বড় পেয়ারা পাড়তে লাগল। কুড়ি খানেক হয়ে যেতে নামিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, 'যা শালা, নিয়ে পালা।'

পরনের ছোট লুঙ্গি খুলে ফতেহার পেয়ারাগুলো কুড়িয়ে বেঁধে মাথায় করে নিয়ে মাঠ পার হয়ে ছুট দিল। সরমা দেবী স্নান করতে এসে পড়লেন ঠিক সেই সময়। সিদ্ধেশ্বর বললেন, 'দেখলে, শালা নেড়ে ফোচকেটার কাণ্ড! পেয়ারা চুরি করে নিয়ে পালাল!'

'ধরতে পারলে না?'

'কাঁধে উঠে পেয়ারা পাড়লে ধরব কি করে?'

'তোমার কাঁধে উঠেছিল! কে ওটা?'

সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী মুখ টিপে শুধু একটু হাসলেন।

সরমা দেবী আন্দাজ করতে পারলেন। বললেন, স্বর্ণর ছেলে বুঝি?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সিদ্ধেশ্বর।

ফতেহার ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে ডাকতে লাগল, 'মা, ওমা, দেখ কত ডাসা পাকা পেয়ারা এনেছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে পেয়ারাগুলো দেখে অবাক হল আসমা। বলল, কোথা পেলি রে এত পেয়ারা?'

'ঐ বাগানের।'

'গাছে চড়ে পেড়েছিস?'

'হাঁ।'

'কেন?' মারার জন্যে একটা কঞ্চি তুলল আসমা। বলল, 'এইটুকুন পুঁচকে ছেলে, মুখ টিপলে দুধ বেরোয়, চোর হয়েছ তুমি? না বলে পরের জিনিস হাত দিতে নেই কতবার বলেছি। তোর বাপ জানলে আছড়ে পোঁটা বার করে

দেবে। পেয়ারা খাবি বললে কিনে এনে দিত। কান ধরে পঞ্চাশটা ওঠ-বোস কর।'

'আমি তো চুরি করিনি।'

'গাছে চড়ে পেড়েছিস আবার চুরি করিসনি মানে?'

'সেই বুড়ো দাদু, পাকা চুল মাথায়, বললে, তুই শালা 'নেড়ে'! তারপর বললে কুড়োনো পেয়ারা খাবি না। আমাকে কাঁধে তুলে নিল। কাঁধে দাঁড়িয়ে ডাল ধরে সব বড় বড় পেয়ারাগুলো পেড়েছি। একটাও নেয়নি—সব নিয়ে এসেছি।'

'তোর দাদু তোকে কাঁধে তুলল!'

'হঁা। কেন মা পেয়ারা নিল না?

'আমাদের ছোঁয়া খাবে না—আমরা এখন মুসলমান। হিন্দুরা নিচু জাতের লোকদেরও ছোঁয়া কোনো জিনিস খায় না, নেয় না।'

পেয়ারা খেতে খেতে ফতেহার বলল, 'মা 'নেড়ে কি? দাদু কেন আমাকে 'শালা নেড়ে' বলল?

'নাতি হোস, তাই ঠাট্টা করে গাল দিয়েছে।' আস্‌মা সব কথা বুঝিয়ে বলল না—ছোট ছেলে অত বুঝবে না। সে হিন্দু মুসলমান কিছু বোঝে না।

নুন মাখিয়ে গোটা চারেক পেয়ারা খেলে আস্‌মা। আগে সে কত ফল খেত বাগানের। পাকা কলা সব সময় থাকত ধানের গোলাতে। মুড়ি দুধ আর কলা তার প্রিয় খাদ্য ছিল।

'তোর দিদিমা বা আর কেউ দেখেনি?'

'না।'

'তোর দাদুর সামনে ন্যাংটো হয়েছিলি?'

'হঁা। 'খামি' (লুঙ্গি) না খুললে আনব কিসে?'

'তোর দাদু দিয়েছে ঠিক। নিজে না বললে আর কোনোদিন গাছে উঠে ফল পাড়তে যাবি না। পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবি। ছোটছেলে গাছে উঠলে ভূতে ফেলে দেয়।

রমানাথ দুপুরে আনাজ বেচে হাট থেকে বাজার করে বাড়ি ফিরলে স্বর্ণ পাখার বাতাস করে কাছে বসে। আলু তেল মশলাপাতিগুলো তুলে রাখে ঘরের মধ্যে। ফতেহারের পেয়ারা পাড়ার ঘটনাটা বলে স্বামীকে।

রমানাথ শুনে মনে মনে হাসে কিন্তু বাইরে যেন চাপা রাগে গম্ভীর হয়ে থাকে। ডাক দেয়, 'ফতে—এই ফতু।'

ফতেহার দু'হাতে দুটো কচুপাতা নিয়ে 'মামা ঝিঙে' বা উড়ন্ত ফড়িং ধরতে ব্যস্ত ছিল।

'যাই বাবা!' বলে সাড়া দিল।

একটা উড়ন্ত ফড়িং ধরে এনে শাড়ির পাড়ের সুতো দিয়ে ল্যাজে বাঁধে ফতেহার। ফড়িংটা ডানা মেলে উড়তে থাকলে সুতো ছেড়ে দেয়। উড়ে উড়ে খানিকটা দূরে গিয়ে বসে পড়ে। আবার ধরে আনে। তাকে জড়িয়ে ধরে ফৈজি সেখ সস্নেহে বলে, দাদুর কাঁধে উঠেছিলি?

'পৈতে জড়িয়ে গেল পায়ে!' খুব আমোদ পেয়ে বলল ফতেহার।

তোর দাদুর বন্দুক আছে, যাসনি বাগানে।'

'দাদু গাল দেয়! কেন বাবা, গাল দেবে আবার পেয়ারা পাড়তে দেবে কেন?'

'বড় মানুষের খেয়াল!'

বাজার থেকে আনা শসা কেটে নুন মাখিয়ে বাপবেটাকে খেতে দেয় স্বর্ণ।

খেতে খেতে ফৈজি বলে, 'ওদের বাড়িতে বা বাগানে আর যাস নি। দাদু-দিদিমা হয়তো কিছু বলবে না, দেখলে ডেকে বসিয়ে দূর ছি করে আল্‌তো ভাবে কোঁচড পাততে বলে মুড়ি নারকোল-নাড়ু ঢেলে দেবে। পাকা কলা বরফি-বাতাসা-পাটালিও দিতে পারে কিন্তু তোর মামার ছেলেরা ধরে মারতে পারে। হয়তো কুকুর বা 'বকরি' (ছাগল) ধরার মতো আমোদ পেয়ে হরদম পিঠে চড়বে, নয়তো পুকুরে চোবাবে।'

স্বর্ণ বলে, একদম আর যাবি না।'

মাথা নাড়ল ফতেহার।

[৬]

যে বামাচরণ অধিকারীর পাঠশালায় রমানাথ সরদার বাগদির ছেলে হয়েও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল তাঁরই কাছে একদিন নিয়ে গেল ছেলে ফতেহারকে।

বামাচরণ 'বোষ্টম'। তার কাছে আর ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বালাই নেই।

তবে ফরসা চেহারার বাম গুরু মশায়ের তেঁতুলে বিছের রঙের বেতখানাকে এ অঞ্চলের সবাই ভয় করে। বড় রাগ গুরু মশায়ের। যে ছেলে কামাই করে এমন মারবেন যেন পিঠ ফুলে পাঁকাল মাছ হয়ে যায়।

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, অংক, আস্‌কো, কড়াকিযা, গণ্ডাকিয়া, পুনকে, সেরকে, কাঠাকে, দশকে পর্যন্ত লেখা আর পড়া চাই রোজ। কলাপাতায় ভুষো কালি দিয়ে লিখে নিয়ে যেতে হবে। তালপাতায় তিনি পেরেকের আখর কেটে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখে দিতেন—ঘাড় গুঁজে বসে কঞ্চির কলম দিয়ে প্রথমে বুলোতে হবে। তারপর ছিলেটে দেখে দেখে লেখো খড়িমাটির পেনসিল দিয়ে। খড়িমাটি চিবিয়ে খেয়ে ফেললেই মার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ শেষ করলে দ্বিতীয় ভাগ পড়ো। কঠিন কঠিন যুক্ত অক্ষরের বানান শিখলে আর কোনো বাংলা বই পড়তে বাধবে না। আর অঙ্ক হল যোগ, বিয়োগ (তিরিজ), গুণ ভাগের পর জমির কালি করা, পণ হিসাবে খড-নারকেল-সুপারি গোনা, মন সেরের মাপ, আনা গণ্ডায় টাকা-পয়সার হিসেব, আর্যে মুখস্থ করতে হয় শুভঙ্করীর। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ হলে জীবন চলার কাজ আর আটকাবে না। ঘরে পড়ে নাও রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, পুরাণ। সংস্কৃত পড়ে নাও টোল থেকে। আর মুসলমানদের মক্তবে পড়লে শিখবে আরবী, উর্দু, ফারসী। তারপর পড়তে পারবে কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি।

বাম গুরু মশায় ফৈজিকে দেখে বললেন, 'এসো রমানাথ, তুমি তো দেখছি দাড়ি রেখে, টুপি-লুঙ্গি পরে পাকা মুসলমান হয়ে গেছ। কি নাম হয়েছে এখন তোমার ?'

'ফৈজি সেখ গুরু মশায়। এই আমার ছেলে—ফতেহার আলী সেখ। একে আপনার পাঠশালায় ভর্তি করতে আনলাম।'

'এনেছ বেশ করেছ কিন্তু খাতায় নাম তো এক্ষুনি তোলা হবে না—সেই স্বরস্বতী পুজোর দিন পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর নাম তোলা হবে। এখন দাগা বুলোবে। কি রে খোকা, লেখাপড়া শিখবি তো, নাহলে বাঁদর হয়ে যাবি।'

পাততাড়ি বগলে করে এসেছিল ফতেহার। সারি দিয়ে বসা ছেলেমেয়ের পাশে আসন পেতে বসে বসে শ্লেটে অ-আ, ক-খ লিখতে লাগল। ঘরেই সে এসব লিখতে শিখে গেছে। বাম গুরু মশায় তা দেখে খুশী হন। বলেন, 'ঘরে মা-বাবার একটু চেষ্টা না থাকলে শুধু পাঠশালার গুরু মশায়ের ভরসায় লেখাপড়া

হয় না। তা মুসলমানদের ছেলে বলে অনাদর করব না। আমি বৈষ্ণব। ছত্রিশ জাত আমার কাছে সমান। মাসে আট আনা মাইনে দিও।'

'আজ আপনি একটা টাকা প্রণামী নিন '

চৌষট্টিটা তামার পয়সা গুণে গুণে থাক দিয়ে দিল গুরু মশায়ের চৌকির নিচে।

মোড়লদের বৈঠকখানায় তখন পাঠশালা বসাতেন বাম গুরু মশায়।

ছেলেমেয়েদের সুর করে একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ—শটকে বা শতকিয়া পড়াতে লাগলেন। সবাই উচ্চৈঃস্বরে পড়তে লাগল।

ফৈজি দু-পাশে বনঝোপ ঘেরা খাল ধারের পথ ধরে বাড়ি ফেরার সময় ভাবতে লাগল তাদের গ্রামেও একটা পাঠশালা হওয়া উচিত। নইলে মুসলমানরা তো কেউ লেখাপড়া শেখে না। অনেকেই নামাজ পড়তেও জানে না।

সেদিন সন্ধ্যাতেই ফৈজি সেখ জোলো খাঁ কাজীর কাছে গেল গ্রামে পাঠশালা খোলার কথা বলতে। বাইরের বৈঠকখানায় রেড়ির তেলের দুটো প্রদীপ জ্বলছিল দুটো পিতলের পিলসুজের মাথায়। হরিণের শিং, মাগুরা পরগনার মানচিত্র, শঙ্কর মাছের চাবুক, গোটা তালপাতার বিশাল একখানা রঙ-চিত্রিত পাখা টাঙানো ছিল দেওয়ালের গায়ে। মাদুরী বাঁধানো টানা পাখা ঝুলছে ঘরের কড়িকাঠের একদিকে, মেঝের একপাশে খাটের বিছানায় তাকিয়া পাতা। রুপোর বোল বোলাও আর পান-দানী মেঝের ওপর বসানো। মেঝেতে পাতা শতরঞ্চি।

লোকজন তখন কেউ ছিল না। একাই বসেছিল ফৈজি সেখ। হঠাৎ জাফরানী রঙের শালোয়ারকামিজ পরা অষ্টাদশী এক তন্বী যেন বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো সেই ঘরে এসেই বেরিয়ে গেল।

ফৈজি জানে, এটি জোলো খাঁ কাজীর ছোট বিবির মেয়ে। নাম রুকসানা বেগম। ওর বিয়ে হয়েছিল কলকাতায় খুব বাজি-বাজনা খরচ-খরচা করে মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের কোনো ছেলের সঙ্গে। কলকাতার বাড়িতে বউ হয়ে বছর খানেক থাকার পর জামাইয়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রুকসানা আর যায় নি।

তবে নিয়ামত হোসেন বলেছিলেন, 'কাজী সাহেবের ছোট জামাই কুদ্দুস মিয়া মাতাল, ঘুড়ি ওড়ানো, ঘোড়া ছোটানোর খেলায় মগ্নই শুধু নয়, জুয়া খেলে, শতরঞ্জ খেলে আর নানান বাঈনাচ করা গাইয়ে মেয়েদের পেছনেও নিত্য

ঘোরেন। টাকাপয়সা ওড়ান। রুকসানাকে মারধর করেন। বাপের বাড়ি থেকে যা সোনা-রুপোর গহনা জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল রুকসানা সবই নাকি ফুঁকে দিয়েছেন। এখানে এসেও মাতলামি করে রুকসানার মুখে ঘুঁসি মেরে ফুলিয়ে দিতে জোলো খাঁ কাজী তাঁর পিঠে শঙ্কর মাছের চাবুক কষিয়ে ছিলেন মাত্র ঘা তিনেক। তাতেই নাকি ভীমরুল ছুটে গেল! জামাই ভোঁ দৌড় দিলেন। পরে কাজী সাহেব দুঃখ করে বলেছিলেন, জামাইকে মারা অবশ্যই নিন্দনীয় কিন্তু উপায় ছিল না। :তিনি আবার পঞ্চাশ ভরি সোনার গহনা দাবি করেছিলেন, নইলে নাকি রুকসানাকে তালাক দেবেন।'…

কিন্তু তিন বছর গত হয়ে গেল জামাই কুদ্দুস আর তালাক দিচ্ছেন না। তিনি বিবিকে তালাক না দিলে অন্য কারো সঙ্গে সাদী দেওয়াও যাবে না। লোক মারফত তালাক চাওয়া হলে কুদ্দুস মিয়া বলেন, 'আমি হলাম নবাবজাদা, ফন্দিফিকির আমাদের কাছে এখন জোলো-খাঁ কাজীর সাত পুরুষকে শিখতে হবে। আমি না তালাক দিলে কার বাপে জোর করে তালাক দিতে পারে? খোরপোষের মামলা দায়ের করতে কাজীর মতো শরীফজাদাও ইংরেজের আদালতে যাবেন না। মুসলমানদের 'সরার' আইনে যে সব মোল্লা-মৌলবী হাজির হবেন তারা তো 'সুন্নী'—আমরা 'সিয়া'—কে তাদের তোয়াক্কা করে! মেয়ে নিয়ে এবার ধুয়ে খাক কাজী বুড়ো। 'জালা' ভেঙে খোলা হয়ে গেছে—এখনো কী রোখ্! তবু তো বরের জন্য হাতি পাঠাতে পারেন নি, পাঠিয়েছিলেন আরবী ঘোড়া!'…

ফৈজি সেখ বুঝেছিল রুকসানাকে সাদি করার মতলবেই মৌলবী নিয়ামত হোসেন জোলো-খাঁ কাজীর এত বাধ্য হয়ে ধর্ম প্রচার আর নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মুসলমান করার 'নেকি' বা পুণ্য করে চলেছেন পূর্ণ উদ্যমে। কিন্তু পথ নেই। পথে কাঁটা। আর রুকসানা নিয়ামত হোসেনের কাছে লেখাপড়া শিখলেও তাঁর মতো আশ্রিত এক মানুষকে জামাই করা কাজী সাহেবের পক্ষে আর্থিক কৌলীন্যের জন্য সম্ভবও ছিল না।

জোলো-খাঁ কাজী বৈঠকখানায় আসতেই ফৈজি সেখ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম নাজাল।

কাজী সাহেব তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতেই একজন বুড়ো কর্মচারী বোল বোলাওয়ে বালাখানা খসবু তামাক সেজে দিয়ে বাটা ভরা পান রেখে গেল।

কাজী সাহেব বললেন, 'কি খবর ফৈজি মিয়া? ভাল আছ তো?'

'জী হুজুর, আপনার কাছে জানাতে এলাম যদি আমি আমাদের গ্রামে একটা পাঠশালা করি…।'

'পাঠশালা নয়, মাদ্রাসা। বাংলা ও পড়াবে, তার সঙ্গে আরবী। মুসলমানদের আগে লেখাপড়া জানা চাই। নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আগে পাঠান-মোগল আমলে যে হারে মুসলমান হয়েছে, ইংরেজ আমলে তা হচ্ছে না। সুফি মতবাদে বিশ্বাসীদের কথা জেনে হিন্দু নিম্নবর্ণের লোকদের স্বধর্মে রক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাত বিভেদ নেই। যাক গে, যে সমস্ত নিচু জাতের লোকেরা মুসলমান হয়েছে, তারা সবাই নিম্নবিত্ত, এরা আরো পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে শিক্ষাদীক্ষার চর্চা না করে কেবল জীবজন্তুর মতো বেঁচে থাকতে চাইলে কি অবস্থা হবে, ভাবতেই আমি শিউরে উঠি। শেষ দশায় মোগল বাদশা, আর নবাবদের বংশধররা রাজনৈতিক হানাহানিতে ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি 'নালন্দার' মতো বিশ্ববিদ্যালয় করতেন তাঁরা বিবির কবরের জন্য সাতকোটি টাকা খরচ না করে তাহলে বোধ হয় মুসলমানদের হাত থেকে রাজত্ব যেত না। মদ আর মেয়ে মানুষই বাদশা-নবাবদের পতনের প্রধান কারণ ছিল। বংশ মর্যাদা বড় নয় ফৈজি মিয়া, শিক্ষাদীক্ষাই হল আসল। বনেদীর আঁস্তাকুড়ও ভাল, একথা আমি মানি না। বনেদীর বংশে আজ নিদারুণ কলহ, হানাহানি, কুৎসিত নোংরামি। আমার ভুল হয়েছে, বংশ মর্যাদা দেখতে গিয়ে আমার সোনার কন্যা রুকসানাকে বলি দিলাম। নবাব জাদা বলে পরিচয় দিলেই আমি ভয় পাই। এরপরেই পীরহানের 'জ্যাব' (পকেট) থেকে নরম পাৎলা টিনের গোল করে মোড়া বংশ-লতিকা খুলে দেখাবেন এক কড়ার সরকারী মাসোহারা বেতনভুক তিনি। কিছু সাহায্য চান। যে হাত পাতবেন সে হাত শীর্ণ হলেও নরম, কখনো কাস্তে কিম্বা কোদাল ধরেনি। প্রবাদ ছিল, সৈয়দ কাজীদের বাড়ির কর্তাদের কখনো লাঙল-কোদাল ধরতে নেই—মেয়েরা গোবরে হাত দেয় না, বাড়িঘরের কাজ-কাম করে না—এটাই হল সর্বনাশের মূল। নিষ্কর্মা হবার মূল মন্ত্র। যে নবাব নিজের হাতে জুতো পরতে গিয়ে মান-মর্যাদা হারানোর চেয়ে যদি শত্রুর হাতে প্রাণ দেওয়াও ভাল মনে করতেন তাঁর না বাঁচাই উচিত।' অথচ

শাহান শা আকবরের পা দুটো 'ফ্যাটা' হয়ে গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে থেকে থেকে। তিনি ঘোড়ায় চড়ে খরস্রোতা নদীও পার হয়ে যেতে পারতেন। সম্রাট বাবর পিতার রাজ্য ফরগনা মুলুক হারিয়ে যখন কিছু সৈন্য নিয়ে আফগানিস্তানে পলাতক হলেন, কড়া শীতের রাতে সেই বারো বছরের বাবর বা জহিরউদ্দীন আহমদ ঘোড়ার পিঠ দলছিলেন। আর রাজ্যপাট পাবার পর সেই মুসলমানের বংশধররা বিলাসী হয়ে কী শোচনীয় ভাবে অধঃপাতে গেলেন তার ইতিহাস পড়লে কান্না পায়। একশো বছর আগে একজনও অশিক্ষিত আর বিত্তহীন মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া যেত না আর এখন?'

নাস্তাপানি এনে দিল ফৈজি মিয়াকে বুড়ো কর্মচারীটি।

ফৈজি বলল, 'মুসলমানরা আবার কখনো কি তাদের রাজত্ব উদ্ধার করতে পারবে?'

'কি করে আর পারবে? অসম্ভব। ভায়ে ভায়ে মিল আছে? একজন আর একজনের সুনাম বা কল্যাণ করে? শিক্ষার জন্য এদের কোনো রকম উদ্যম আছে? এখন আমরা কেবল আল্লার ভরসায় থেকে নামাজ পড়তে বলছি আর বউকে তিন চারটে বাচ্চা সমেত তাড়িয়ে দিয়ে ভিখারী উৎপাদনের কাজ করছি।'

'অথচ হিন্দুদের উচ্চবর্ণের লোকরা ইংরেজি শিখে জজ ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কত কি হয়ে যাচ্ছেন। মুসলমানরা দু-চারজন বড়জোর থানার বড় দারোগা। তাতেই আঙল ফুলে কলাগাছ!'

ফৈজির কথায় হাসতে লাগলেন জোলো খাঁ কাজী। হঠাৎ সেই সময় দুম্ করে যেন তাঁর কোল্‌জেটা টিপে ধরল ফৈজিমিয়া। বলল, 'আচ্ছা হুজুর, আপনার কন্যা রুকসানাকে আজ আমি দেখলাম। এমন মেয়ের দুর্ভাগ্য হয় কি করে? আপনি কি মৌলবী নিয়ামত হোসেনকে জামাই করতে পারেন না?'

কাজী সাহেব যেন ময়ুর দেখে সাপের মতো কোঁচকাতে লাগলেন। বললেন, 'না পারি না। ইচ্ছা থাকলেও পারার পথ কোথা?'

'আপনার ইচ্ছা আছে?'

'আছে ফৈজি আছে। বোধহয় রুকসানাও আমার জামাই কুদ্দুসকে মন

থেকে ভালবাসতে পারে নি। তার মন ছিল ঐ দিল্লি অধিবাসী আরবের সৈয়দ বংশীয় সুন্দর দেখতে মৌলবী নিয়ামতের দিকে। আমার মসজিদের ইমাম করে আনি ওঁকে দিল্লি থেকে। মাসে একশো টাকা মাইনে দিতাম আগে ওঁকে। উনি নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করেন নি। কেবল মাদ্রাসা আর মসজিদ গড়ার কাজে সব ব্যয় করেছেন। কত ছেলে মেয়ের জন্য কোরআন শরীফ কিনে দিয়েছেন জানো?'

'কত হবে হুজুর?

'বারো হাজার!'

'তাহলে আপনি আর দ্বিধায় থাকবেন না—খুব জোর ধরুন—যেন তেন প্রকারে...'

মৌলবী নিয়ামত হোসেন সালাম জানিয়ে এসে ঢুকলেন।

বুড়ো কর্মচারীটি পাখা টানা বন্ধ রেখে অল্প কিছুক্ষণ পরেই সরবৎ এনে দিয়ে গিয়ে আবার পাখা টানতে লাগল।

কাজী সাহেব চোখ বন্ধ করে গভীর কোনো চিন্তায় যেন মগ্ন ছিলেন দেয়ালের গায়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে। গালের নিচে বাঁ হাত মোড়া।

হীরের আংটি জ্বলছে আঙুলে প্রদীপের আলো লেগে।

নিয়ামত হোসেন বললেন, 'হুজুরে পাক আপ্‌কা তবিয়ত আচ্ছা তো?'

ডুবন্ত মানুষ হঠাৎ জলের ওপর ভেসে ওঠার মতো চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন কাজী জোলো খাঁ, 'তবিয়ত কা বাত ছোড় দিজীয়ে—বহুৎ পেরেশানী লাগতা হ্যায় দীল্‌ মে।' দীল্‌মে মেরা চোট হো গিয়া রুকসানা কি লিয়ে। কি হবে, কিছু ভেবে পাই না।'

লম্বা আঙুল হেঁট মাথায় মেঝের শতরঞ্জিতে আঁকিবুকি কষতে লাগলেন নিয়ামত হোসেন। প্রদীপের আলোর সামনে একটা প্রজাপতি এসে নাচানাচি শুরু করেছিল।

ফৈজি বলল, 'এ বিষয়ে আপনি কি কিছু করতে পারেন না হুজুর?'

মৃদু একটু হাসলেন নিয়ামত হোসেন। সেই হাসিতে আছে বেদনা আর আনন্দ। কান্না আর হাসি। অন্ধকার আর আলো। তার ইতিহাস যেন হিমশৈলের মতো বারোগুন ডুবে আছে অতীত সমুদ্রের গভীরে। দুরবস্থায়

পড়া বনেদী ঘরের সন্তানকে মসজিদের ইমাম বানাতে তুলে আনলেন জোলো-খাঁ কাজী। মনসবদার বা কাজী আর তিনি ছিলেন না। শুধু সাত হাজার বিঘে জমির মালিক ছিলেন। তাও মণ্ডল জমিদারদের হাতে সমর্পণ করেছে ইংরেজ সরকার। তারজন্য মাসে তিন হাজার টাকা নজরানা পান। লাখেরাজ সম্পত্তি আছে এখনো দেড়শো বিঘে। ক্রমেই কমে আসছে।

ফৈজির হাতে টোকা মেরে ইসারা করেন, এ বিষয়ে তুমি কিছু বলো না।

তবু ফৈজি কানে কানে বলতে যায় কিছু।

কাজী সাহেব তখন 'শুভরাত্রি' জানিয়ে অন্দরে চলে যান।

ঈশার নামাজের আজান শুরু হতে ফৈজিকে সাথে নিয়ে মসজিদে এসে নিয়ামত হোসেন ওজু করার পর নামাজ পড়ান।

তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে জোলো-খাঁ কাজীও নামাজ পড়েন।

মসজিদ ভর্তি লোক হয় না।

শুধু শুক্রবার দুপুরে জুম্মার নামাজে মেলা লোক হয়। অনেকে হাজুত ভাত, বাতাসা, 'সন্দেশ' বরফি এনে নামাজীদের মধ্যে বিতরণ করে।

নিয়ামত সাহেব এসব কখনো খান না। তাঁকে খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলেন, 'কি করে জানব আল্লার নামে মানত-করা খাসী বা মোরগের 'হাজুত-ভাত' দানকারী সুদখোর নয়? সুদখোরের এক রত্তি খাদ্যও হারাম বা ময়লার সমান।'

বাড়িতে আনলেন তিনি ফৈজিকে। বসালেন নিজের বিছানার ওপরে।

ফৈজি বলল, 'আপনার বয়স এখন চল্লিশ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, শরিয়তে অবিবাহিত থাকা নিষিদ্ধ কিন্তু আপনি যে তা রয়ে গেলেন?'

'গুরুমারা বিদ্যা শিখেছ তো খুব!' বললেন নিয়ামত হোসেন। 'বউকে খেতে দিতে হবে না? কুড়ি বছরের ছেলে যখন আমি এখানে আসি, দশ বছর মাইনে পাই আর দশ বছর ঠিক করি নামাজীদের দানের পয়সা যা ডিবের মধ্যে পড়বে তাই শুধু নেব। কিন্তু কাজী সাহেব ঠিক মাস গেলেই ডিবের মধ্যে একশোটি টাকা দিয়ে যেতেন। এখনো দেন। সেসব টাকা তো আমি নানান হিতকর কাজে দান-খয়রাত করে দিই। প্রতি ঈদুল ফিতরের সময় কাজী সাহেব জামা-কাপড় দেন। মিলাদ শরীফে কোথায় কোথায় চলে যাই। সংসার করার সময় পাই কই? এরপর হয়তো এখানের ইমামতি

ছেড়ে মুসাফির হয়ে কোনো দূর দেশে চলে যাব। যেতে পারি না শুধু ঐ বুড়ো মানুষ কাজী সাহেবের জন্যে। ওঁর ওপরে একটা মায়া পড়ে গেছে। ওঁর চারবিবির ন-জন ছেলে। তাঁরা জমি-জায়গায় খোঁজ-খবর রাখেন না। কেউ কেউ শ্বশুর বাড়িতে থাকেন। খান-দান ঘুমোন। মসজিদে নামাজ পড়তেও আসেননা সব সময়।'

'আপনাকে একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আপনি কি সাদির প্রতিশ্রুতি না পেলে রুকসানার পথের কাঁটা তোলার জন্যে তদ্বির তদারক করতে চান না?'

'তোমাকে একথা কে বলেছে?

'না, কেউ বলে নি। আমি বলছি। আপনার বিশেষ করে রুকসানার বিষয়ে কথা উঠতে কাজী সাহেব এমন কথা জানিয়েছেন যাতে বোঝা যায় আপনাকে তিনি জামাই করার ব্যাপারে অমত নন। আগে সে কাজ না করে অনুতাপ করতে লাগলেন।'

'তোমার সামনে?'

'হ্যাঁ'।

'তাহলে তো রোগটা শোকের পর্যায়ে গিয়ে একেবারে হৃৎপিণ্ডের মূলে ঠেকেছে।'

কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে নীরব ভাবে কাটল।

নিয়ামত মৌলবীর খানা এনে পৌছাল বুড়ো কর্মচারী রমজান মিয়া। হাঁসের ঠোঁটের মতো তার থ্যাবড়া নাক। মৌচাকের আকারের ঝোলা দাড়ি মেহেদি পাতার কষে লালচে করা। আর গুলিভাঁটা চোখ দুটো বেরিয়ে থাকে যেন মনিবের সব কিছু পাহারা দিচ্ছে।

ফৈজি উঠে পড়ল। বলল, 'আমি প্রতিশ্রুতি আদায় করে দোব, আপনি তদ্বির করুন। নচেৎ আমিই কাজী সাহেবের জামাইয়ের কাছে যাব।'

'তিনি তাহলে তোমাকে খুন করে দেবেন। বড় খানদানী বংশের সাহেব জাদা।' ঠাট্টা করে বললেন নিয়ামত হোসেন। তিনি জামা-কাপড় খুলে ফেলে খাবার জন্যে উদ্যোগী হলেন। বললেন, খাবার দেখে সাহসী মুসলমানের পালাতে নেই হে।'

'বিস্‌মিল্লা পড়ুন। আল্লা আমার ঘরে খাবার মোতায়েন রেখেছেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর আপনাকেও।'

ফৈজি সেখ পথ চলতে চলতে রুকসানার অবাক হওয়া চাউনিটার কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ ম্লান হয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে নিয়ে চলে গেলেন কেন? ধনী লোক মাত্রেই সুখী আর গরিব মাত্রেই দুঃখী একথা ঠিক নয়। বড়র আবার বড় দুঃখও আছে।

মেয়েটির জন্য কি করা যায়?

তার চাইতে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধর্ম আর শিক্ষার জন্য জীবন ব্যয়কারী মৌলবী নিয়ামত হোসেনের জীবনের ওপর চাপা গোপন প্রণয়-পাথরটা তুলে ফেলা। হঠাৎ ফৌজির মনে হল, আরে, সে কি বোকা রাম-ছাগল! মৌলবীকেই বলতে গেল তাঁর নিজের বুকের পাথর তুলে ফেলার তদ্বির করতে? কুদ্দুস মিয়া কি জানেন না তাঁর বিবি রুকশানার মনখানা জুড়ে এই পরোপকারী দরবেশটি বসে আছেন। তিনি কি এঁকে সহজে পথ ছেড়ে দেবেন?

[৬]

কলকাতায় কোনোদিন যায় নি ফৈজি সেখ। গোরা সাহেব মেমদের নাকি সেখানে অনেক দেখা যায়। তারা গাড়িঘোড়া চড়ে বেড়ায়।

নবাবজাদা আলী কুদ্দুস খাঁ-র ঠিকানা নিয়ে একদিন ফৈজি সেখ কল-কাতায় এসে রাজপথ, লোক চলাচল, বাড়িঘর দেখে অবাক হল। মধ্য কলকাতায় একটি দোতলা বাড়ির সামনে এক মুসলমান বুড়োকে জিজ্ঞেস করার পর ফৈজি জানতে পারল সেই ফর্সা চেহারার রোগা বুড়োটির তৃতীয় সন্তানই কুদ্দুস সাহেব।

বৈঠক খানায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কুদ্দুস সাহেব নেমে এলেন। পরনে রেশমী চোগা। তার ওপরে মখমলের কাবা। পাট্টা জুলপি আর গোঁফ আছে। দাড়ি চাঁছা। বসার পর সালামের উত্তর দিয়ে প্রশ্নালু চোখে তাকালেন যুবক কুদ্দিস।

ফৈজি বলল, 'অসময়ে এসে আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম হজরত! আমি আসছি আপনার শ্বশুর জনাব জোলায়-খাঁ কাজীর কাছ থেকে। আপনার বেগম সাহেব রুকসানা সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

'বলে যাও তুমি।'

'তিন বছর হল আপনাদের মধ্যে আর কোনো রকম যোগাযোগ নেই স্বামী-স্ত্রীতে। কাজী সাহেব অসুস্থ। তিনি আপনার ওপরে রুষ্ট হয়ে যে ব্যবহার করে ফেলেছিলেন তার জন্য বিশেষ ভাবে দুঃখিত। আমার কাছে অনুশোচনাও করেছেন। এখন কথা হল আপনি কি রুকসানাকে নিয়ে আসার অনুমতি দেবেন হজরত?

'না। তার মুখে আমি থু থু ফেলে দিয়েছি।'

'তাঁকে তাহলে হুজুর মন থেকে ত্যাগ করেছেন?'

'এক রকম তাই।'

'আবার আপনি সাদি করেছেন?'

'তবে কি তার জন্য বসে থাকব?'

'তাহলে এতদিন শরিয়তের বিধান অনুসারে তালাক না দিয়ে ঝুলিয়ে ফেলে রাখা অবৈধ—খোর-পোষের দাবি এসে পড়ে কিন্তু কন্যাপক্ষ সে দাবি করছে না আর তালাক চাইলেও দেন মোহরের দাবিও করছেন না। এ ক্ষেত্রে আপনি কি দয়া পরবশ হয়ে বেগম রুকসানাকে তিন তালাক দিয়ে মুক্তি দিতে পারেন না?'

নবাবজাদা উঠে পিছনে হাত বেঁধে কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর হঠাৎ বললেন, 'পারি, পঞ্চাশ ভরি সোনা লাগবে, আর জোলো-খাঁ কাজীকে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে।'

'সোনার দাবি আর পিতৃপ্রতিম শ্বশুরকে পায়ে ধরানোর প্রস্তাব আপনাদের মতো শরীফ নবাব বংশের পক্ষে আশালীন হজরত—আপনি উত্তেজিত না হয়ে ভেবে দেখুন।'

এই সময় বাইরে দাঁড়িয়ে বুড়ো মানুষ নবাব লতাফত খাঁ সব কথাই বোধ হয় শুনেছিলেন! ভেতরে এসে বললেন, 'কুদ্দুস, নিঃশর্তে তুমি তালাক দাও। তালাক না দিয়ে তিন বছর বউকে ঝুলিয়ে রাখাও পাপ। তাছাড়া খোর-পোষের দাবি আর দেনমোহর বাবদ বিশ হাজার টাকা যখন মাফ হয়ে যাচ্ছে তখন তালাক না দেবার পক্ষেও কোনো যুক্তি নেই। রেষারেষির পর ইংরেজের আদালতে উঠতে হলে আমাদের নবাব বংশেরও মর্যাদা যাবে। অর্থদণ্ড হলে আমরা দেবো কোত্থেকে?'

'আপনি চুপ করুন আব্বাজান। আমার ব্যাপার আমাকে দেখতে দিন।'

'তুই ধ্বংস হয়ে যাবি আর তোর সঙ্গে আমাদেরও টেনে জাহান্নামে নামাবি।' বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন নবাব লতাফত খাঁ।

শালোয়ার-কামিজ-পরা ওড়না গায়ে মাথায় দিয়ে অপেক্ষাকৃত স্থূল চেহারার যুবতী এক মেয়ে হাত ইসারায় কুদ্দুস খাঁকে ডাকতে তিনি তাঁর সঙ্গে পাশের ঘরে ঢুকলেন। সম্ভবত এই মহিলাটি কুদ্দুস সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী।

উর্দু ভাষায় তাঁরা কথা বলছিলেন।

'মেরা কসম, আল্লা কি কসম, তুম ছোড় দো, তিসরি বরষ গুজার গিয়া। তিসরি তালাক দে কর উন্‌সে খালাস দে দো।' বললেন মহিলাটি।

'দেগা, জরুর দেগা, লেকিন বুড্‌ঢাকো হাম বেকসুর ছোড়েঙ্গে নেহি।

'মাফ কর দো উন্‌কো। বে-তালাক বিবিকা আঁসুসে গজব নিক্‌লে গা। উ যিত্‌না গুনাহ্ করেগা সব তুম্‌সে গিরে গা।'

'ঠিক হ্যায়, তুম যাও—ম্যায় দেখতা হ্যায়।'

মেয়েটি তার গুরু ভার নিতম্ব আন্দোলিত করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

কুদ্দুস সাহেব এসে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়ার পর বললেন, 'ঠিক আছে, তালাক আমি দেবো। কতটা সোনা আপনারা দিতে পারবেন?'

মাথা চুলকোতে লাগল ফৈজি সেখ বলল, 'জনাব জোলায়-খাঁ কাজীর অবস্থা এখন তেমন সচ্ছল নয় হুজুর। পঞ্চাশ ভরি নয়, দশ ভরি সোনা আমি যেমন করে পারি আপনাকে দিয়ে যাব।'

'দশ নয়, বিশভরি সোনা আমার চাইই। নতুবা হবে না। তার জন্যে আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি।'

সুজির হালুয়া আর দু-খানা পরোটা, একবাটি মাংস রান্না এনে নাস্তা দিয়ে গেল একটি বাচ্চা মেয়ে।

হাত চেপে ধরল ফৈজি সেখ। বলল, 'হুজুর, দয়া করুন, কাজী সাহেবের হয়ে আমি আপনার পায়ে ধরছি, ঐ দশভরিই নেবেন।'

'পনেরো ভরি দেবেন। যেদিন আনবেন সেদিনই তালাক দিয়ে তালাকনামা

হাতে ধরিয়ে দোব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তালাক নেবার পর কার সঙ্গে রুকের সাদি হবে বলতে পারেন কি ?

ফৈজি বলল, 'জানি না হুজুর। দ্বিতীয় বারের নিকাহ্ তো প্রথম বারের মতো হয় না। হতে পারে কোনো সাধারণ গরিব চাষী বাড়িতে বউ হয়ে যাবেন তিনি, অথবা কপালের যা লিখন আছে—তাই হবে।'

'তাহলে ঐ কথা রইল, এখন আসি।' কুদ্দুস সাহেব ওপরে উঠে গেলেন মনের আনন্দে শীস্ দিয়ে হেলতে দুলতে।

ফৈজি সেখ নাস্তা শেষ করে বিকালের নামাজ পড়লো আজান-হওয়া কাছের মসজিদের মধ্যে এসে। তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে চলল দক্ষিণ দিকে। সারারাত সে হেঁটে চলার পর ভোর বেলায় বাড়ি এসে পৌছল। গায়ে তার তখন বেশ জ্বর উঠেছে।

আস্মা কপালে হাত দিয়ে দেখে বলল, 'এত জ্বর নিয়ে সারারাত হেঁটে কি চেহারাখানা করে এসেছ বলো তো !

কিছু ভয় নেই—এক ঘুম দিলেই চাঙ্গা হয়ে যাব আস্মা। নবাব বাড়ির মাংস পরোটা হজম করতে পারেনি অধম বান্দা। কোলজের তেজ নেই অত পিঁয়াজ রসুন তেল-মশলা হজম করার।' অথচ রসুলে আক্রাম হজরত মহম্মদ কাঁচা পিঁয়াজ তো খেতেনই না, যে তরকারীতে পিঁয়াজ ব্যবহার করা হয়েছে তাও তিনি বর্জন করতেন।'

জামা-কাপড় ছাড়িয়ে ভিজে গামছায় পা মুছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে গা হাত-মাথা টিপতে বসল আস্মা। তার ছেলে তখন উঠে এসে বলল, 'মা ক্ষিধে লাগছে। দিদিমা যে কলা পাঠিয়েছিল তাই দিয়ে ভাত খাব।'

'মুখ ধুয়ে আয়, বাইরে যা আগে।—মা এক কাঁদি পাকা কলা দিয়েছে খোকাকে ডেকে কাল সন্ধ্যার সময়। কিছু খাবে না এখন ?

গরম পানি বা বার্লি-সাগু ছাড়া এখন কিছু খাওয়া উচিত নয়। যদি খুব পেটের যন্ত্রণায় আছাড় খাই জিউলি গাছের ছাল তুলে এনে থেঁতো করে কষটা একবাটি খাইয়ে দিয়ো, অম্বল পিত্তি থাকলে উঠে যাবে।' কলকাতায় কত গাড়ি-ঘোড়া লোকজন—উঃ মাথা ঘুরছে !'

'যে কাজে গেলে তার কি হল ? দেখা পেলে, কথা হল ?'

'হাঁ। তালাক দেবেন। তবে পনেরো ভরি সোনা দিতে হবে।'

'বাবা! কি অন্যায় কথা—উল্টো চাপ? আসছি আমি। দুধ গরম করে দোব?'

বলো কি তুমি মেরে ফেলবে? হোটেলে মাংস-ভাত চার আনায় পেট ভরে খেয়েছিলাম—তার ওপর আবার মাংস পরোটা—অম্বল জ্বর হয়েছে—দুধে চর্বি আছে, খেলে ক্ষতি করবে জল গরম করে দাও। কাঁপনি দিয়ে জ্বর হত আমার আগেও তেলেভাজা বা ঝাল-পিঁয়াজের বড়া শামুকের গুটি বা মাংস রান্না খেলে।'

কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাঁপতে থাকল ফৈজি সেখ।

গরম জল আনার পর অনেকটা খেয়ে ফেলল সে। তারপর কাঁথা চাপা দিয়ে গায়ের ওপর উঠে বসে চেপে ধরতে বলল।

ফতেহার মুখ ধুয়ে এসে কলা-ভাত খাবার পর বাপের গায়ে মাড়াতে লাগল।

ঘাম দেখা দিল ফৈজি সেখের। জ্বরের বেগ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে যেতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দাবা-উঠোন নিকোতে স্বামীর নাক ডাকার শব্দ শুনতে লাগল আস্‌মা।

ডোবাতে ছিপ ফেলতে বসেই হঠাৎ ফতেহার চেঁচাতে থাকে। 'মা দৌড়ে এসো, বড় মাছ লেগেছে—শালা হরদম টানাটানি করছে।'

'কি মাছ রে'—বলতে বলতে ছুটে গেল আস্‌মা। ছিপ ধরে টান মেরে ডাঙায় তুলে ফেলল মাছটাকে। দেখল ঘাটের কাছের কালবোস মাছ। আধসেরটাক ওজন। কিন্তু শক্ত নিরেট হয়ে গেছে। বন্যা হলেও এ মাছ ঘাট ছেড়ে যায় না বলে কেউ সহজে মারতে চায় না। মিষ্টি স্বাদের মাছ। ছেড়ে দিতে চাইতে ফতেহার না না করে নাকে কেঁদে লাফাতে থাকল।

'আচ্ছা রাখ।' বলতে ফতেহার খুব খুশী। তার জীবনে সে এই প্রথম এতবড় মাছটা ধরেছে। মাছ নিয়ে সে দেখতে লাগল। বলল, 'কালবোস মাছের গোঁফ হয় কেন মা?'

'ঐ রকম ওর আকার।' 'মেয়ে ছাগলের দাড়ি হয় মা, তুমি দেখেছ? দাদুদের আছে।'

ফতেহার কেবল বকবক করে। অদ্ভুত তার কথাবার্তা। 'দিদিমা ডেকে লুকিয়ে নারকোল নাড়ু মুড়ি দেয়। আল্‌তো করে কোঁচড়ে ঢেলে। ছুঁলে নাকি চান করতে হবে কেন মা? মামাদের ছেলেরা দেখলে ভয় দেখিয়ে তাড়া করে। মুসলমান পাড়ার ছেলেরাও মারামারি করে গাল দেয়।...'

স্বামীকে মাছের ঝোল ভাত দেবার কথা ভেবে মাছটা ঝোড়া চাপা দিয়ে রাখল আসমা। গাই-বাছুর মাঠে বেঁধে দিয়ে এলো। খোঁয়াড় খুলে হাঁস-মুরগি বার করে দিয়েছিল আগেই। দুটো ছাগল ও বেঁধে দিল মাঠের যেখানে ঘাস আছে। মুসলমান পাড়ায় তখন খুব চেঁচামেচি করে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। মল্লিকদের বাড়িতে এ রকম প্রায়ই হয়। পুরুষরা মারপিট করে। লাল পাগড়ি এলেই পলাতক হয়। অনেকেই তাল-খেজুরের তাড়ি খায়।

বেলা দশটার পর ঘুম থেকে উঠে ফৈজি সেখ বাইরে থেকে এসে কোদাল নিয়ে ডাঙার কলাগাছের এঁটে তুলে দরদরিয়ে ঘাম বার করল শরীর থেকে।

রান্না হতে স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে আবার একটা ঘুম দিল।

বিকালে গেল সে নোদাখালীর কাজী বাড়িতে। প্রথমে দেখা হয়ে গেল নিয়ামত হোসেনের সঙ্গে। তিনি বিধবা এক বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রৌঢ়ার কপালে নাকে চন্দনের তিলক। তাঁর ছেলে নাকি কলকাতার বটতলার কোন টোলে পড়ে। রামায়ণ মহাভারত কিনতে হবে, টাকা-পয়সা নেই—তাই সাহায্য চাইছেন।

মহিলা বললেন, 'বাবা, তোমার নাম খুব শুনেছি। গরিবের ছেলের লেখা-পড়ার জন্যে বইপত্র জামা-কাপড় কিনে দাও। আমার ছেলে মানুষ হয়ে টোল-পাঠশালা খুলে লেখাপড়ার চর্চাই করবে।'

নিয়ামত হোসেন কয়েকটি টাকা নিয়ে বিধবার হাতে দিলেন। তিনি চলে যাবার পর বললেন, 'কি খবর ফৈজি মিয়া?'

'কলকাতা থেকে ফিরলাম।'

ফৈজিকে বসিয়ে সব কথা শুনলেন নিয়ামত হোসেন। হঠাৎ সেখানে রুক-সানাকে উদয় হতে দেখে ইমাম সাহেব যেন চমকে গেলেন। বললেন, 'তুমি এখানে, হঠাৎ!'

'আব্বাজীর শরীর ভাল নেই। আপনাকে এক্ষুনি ডাকতে বললেন। ভাইরা কেউ নেই এখন বাড়িতে—ঘোড় দৌড়ে গেছে। রমজান হাটে গেছে। এক্ষুনি আসুন।'

'চলো যাচ্ছি। এসো, ফৈজিমিয়া, দেখি আবার কাজী সাহেবের কি হল হঠাৎ।'

বিশাল বাড়িখানায় কত যে ঘর আছে তার হিসেব পায় না ফৈজি। চারি-দিকে বাড়ি—মাঝখানে উঠোন। সমস্ত বাড়িটার তলায় আছে গড়।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলার একটি সাজানো ঘরে নিয়ে গেল রুকসনা। কয়েকজন বিবি সরে গেলেন পাশের ঘরে। পালঙ্কের ওপর শুয়েছিলেন জোলো-খাঁ কাজী।

সালাম জানাবার পর ইমাম নিয়ামত হোসেন্ কুরশি টেনে নিয়ে বসলেন। ফৈজিও বসল আর একটা কুরশি নিয়ে পায়ের দিকে।

কাজী সাহেব বললেন খুব শান্ত ক্ষীণস্বরে, 'হঠাৎ বুকের ভেতরটায় যেন তরঙ্গায়িত হয়ে শূন্য একটা কিছু উঠে আসছিল। তারপর মাথা ঘুরে গেল। গোসলখানা (স্নানঘর) থেকে বেরুবার পর এমন হল হঠাৎ। কখন পড়ে গেলাম মনে নেই। দাঁতি লেগে গিয়েছিল নাকি। হাত-পা এখনো যেন অবশ।'

নিয়ামত হোসেন বললেন, 'বুকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করেন নি?'

'না।'

'রক্তের ঊর্ধ্বচাপ হয়তো। অথবা পেটের মধ্যে অম্ল পিত্ত জনিত বায়ুর ক্রিয়ায়ও এ রকম হতে পারে। গুরুপাক খাদ্য এখন থেকে আর খাবেন না। শর্করা জাতীয় খাদ্য বা তেল চর্বি ক্ষতি করতে পারে। তবে খাঁটি মধু খেতে পারবেন। সিদ্ধ খাদ্যই উপকার দেবে।'

'হেকিম বুড়ো ঐ যে পাচন দিয়ে গেছেন। ফৈজি মিয়া, কলকাতায় গিয়েছিলে?'

'জী হাঁ হজরত। দেখা আর কথাবার্তাও হয়েছে নবাবজাদা হজরত আলী কুলি গোলাম কুদ্দুস খাঁ সাহেবের সঙ্গে। তিনি পঞ্চাশ ভরি সোনার দাবি করেছিলেন আর'…

নিয়ামত সাহেব হাত মেরে ইংগিত করলেন কাজী সাহেবকে পায়ে ধরার কথাটা চেপে যেতে।

'আমি অনেক বুঝিয়ে আপনার হয়ে ক্ষমা চেয়ে তাঁর হাতে-পায়ে ধরলাম। তাঁর বাবা লতাফত সাহেব নিঃশর্ত তালাক দেবার জন্যে বললেন। দেনমোহর আর খোরাকীর দাবি ছেড়ে দিয়ে যখন তালাক চাচ্ছেন ওঁরা, এখনি শরিয়ত অনুসারে তালাক দিতে বললেন। নইলে ইংরেজের আদালতে গেলে নবাব বংশের ইজ্জৎ যাবার ভয়ও দেখালেন। কিন্তু কুদ্দুস সাহেব আব্বাজানকে আমল দিলেন না। তিনি অভিশাপের সুরে বলে গেলেন ধ্বংস হবে তুমি আর আমাদের ও সেই জাহান্নামে টেনে নামাবে। তখন তাঁর বিবিজান—'

'কার বিবিজান ?' শুধোলেন কাজী সাহেব।

'আপনার জামাইয়ের। মোটা মতো মেয়ে ফরসা অবশ্য নয়—তিনি উর্দু ভাষায় স্বামীকে জানালেন তালাক না দিলে পাপ হবে। তখন কুদ্দুস সাহেব জানালেন বিশ ভরি সোনা দিতেই হবে। আমি অবশ্য তাঁর হাতে ধরে দশ ভরি সোনা নিয়ে রফা করতে আগেই বলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত পনেরো ভরিতে রাজি হয়েছেন।'

'আলহামদো লিল্লাহ' (আল্লাকে ধন্যবাদ)! তোমাকে নাস্তাপানি দিয়েছিল তো ?'

'জী হাঁ হজরত। সুজির হালুয়া, পরোটা আর সুরুয়া মাংস।'

'ঠিক আছে, একদিন তাহলে আবার যাও, 'তক্‌লিফ' (কষ্ট) তোমার হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কি আর করা যাবে। ছেলেদের পাঠালেও তো দুর্ব্যবহার করতে পারে। তবে ফৈজি মিয়া আমি তোমার জন্যে আরো কিছু জায়গা দেবার বিবেচনা করেছি, তুমিও তো ভাসা কাঠ। কিন্তু পনেরো ভরি সোনাও এখন আমার পক্ষে হঠাৎ যোগাড় করা সহজ নয়। আমার আম্মাজান বলেছিলেন, বারো ঘড়া গিনি সোনা নাকি আমাদের এই বাড়ির গড়ের অভ্যন্তরে কোথাও লুকোনো আছে। দাদু নাকি তা রেখে গেছেন। তখন কোম্পানীর আমল। মগ দস্যুদের ভয়ে এটা তিনি করেছিলেন। আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েও পারে নি। সমস্ত দোরের তালায় যা চাবি আছে তা এক ঝোড়া হবে। যাকগে, কবে তোমরা যাবে ?'

ফৈজির চোখ পড়ল রুকসানা বেগম পাশের ঘরের কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে অর্ধেকটা শরীর বার করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ইসারা করলেন ইমাম সাহেবের দিকে।

ফৈজি বলল, 'আমরা বলছেন, একা তাহলে যাব না ? ইমাম সাহেব আর আপনার ছেলেদের কেউ যাবেন ?'

'হাঁ। তিনজনেই ঘোড়ায় চেপে যাবে। অনেকটা দূর পথ।'

'জী হাঁ, চব্বিশ মাইল।' বলল ফৈজি সেখ।

'তালাকনামা লিখে আগে সই করিয়ে তবে সোনাগুলো দেবে। তারপর তিনবার পড়তে বলবে। সাক্ষী পেলে সই করাবে।'

ফৈজি সেখ বলেই ফেলল হঠাৎ, 'কিন্তু হজরত, যাঁর মুখ চেয়ে এই উল্টো

খরচ দিয়েও তালাক বা খালাস নিচ্ছেন তিনি আড়াই ভরি দিলে আমি অধমও আড়াই ভরি সোনা ভিক্ষে-দুঃখ করে যোগাড় করতে পারি।'

ইমাম সাহেবের দিকে তাকালেন কাজী সাহেব। তিনি যেন হতভম্ব। মাথা গুঁজে বসে ইমাম সাহেব বিড়বিড় করে তখন তস্‌বিহ্‌ (জপমালা) দানা দুই আঙুলের মাথায় টেনে টেনে নামাতে লাগলেন।

ফৈজি সেখ হাসল। বলল, 'পীর ইমাম এখন যেন একেবারে শিশুর মতো বোধহীন। আপনার কথা হচ্ছে হুজুর!'

'এঁ্যা! আমার কথা! হজরতের বহুত দয়া কিন্তু আমার বয়স চল্লিশ এখন—সঞ্চয় সামর্থও নেই। ভাবছিলাম মুসাফির বেশে আরবে যাব—হজ করে ফিরব কিন্তু···'

'আপনার অনেক সাগরেদ, মুখ ফুটে কেবল বলার অপেক্ষা। আপনি একজন 'বোজর্গ' (ধার্মিক পরোপকারী) ব্যক্তি হয়েও বিয়ে-সাদি না করার জন্য ভক্তরা মৃদু সমালোচনা করেন। আপনি সেটা বন্ধ করুন।' বলল ফৈজি সেখ।

নাস্তাপানি এসে গেল। রুকসানা নিজেই তা রুপোর থালায় করে জলচৌকির ওপরে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। নকশাদার রুপোর জগ থেকে গেলাশে জল ঢেলে দিলেন।

বালুসাই, জিলাবি, তিলেখাজা, নারকেলের ছাঁই আর হাত-রুটি। কাজী সাহেবের ছোট বিবির মা এসেছেন—সম্ভবত তিনি খাবারগুলি এনেছেন।

নাস্তাপানির পর কাজী সাহেব ওঁদের বললেন, 'সাতদিন পরে ইমাম সাহেব আমার ছোট বিবির ছেলে শাহআলম আর ফৈজি মিয়া যাবে কথা রইল। তোমাদের আর পাঁচ ভরি সোনার ভাবনা ভাবতে হবে না। আমি যোগাড় করে দেবো।'

রুকসানা তাঁর আব্বাজানের কানে কানে বললেন, 'নানীআম্মা (দিদিমা) জানিয়েছেন, পাঁচ ভরি সোনা তিনি দিয়ে যাবেন। তাঁর কোমরে বিছেহার মেখ্‌লা সমেত আছে পাঁচ ভরি।'

'তাহলে তো আর ভাবনা নেই। তোমার মায়ের দশভরি আর নানী-মায়ের পাঁচভরি হলেই হবে।'

বিদায়ের সময় ফৈজি বলল, তবু আমরা যোগাড় করব হুজুর—বরকে তো দিতেই হবে—শরিয়তের বিধানে বরং কন্যার পিতাকে সাদির সময় বরপক্ষ ছাদনা

ভসার খরচ বা যৌতুকাদি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আধাআধি জিনিসপত্র দেওয়ার নিয়ম।

দুজনে যখন বাইরে এলেন তখন সন্ধ্যার অ জান শুরু হয়েছে।

ইমাম সাহেব অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। নামাজ পড়াবার সময় ভুল হয়ে গেল।

খোৎবা পড়ার সময় হঠাৎ তিনি কাঁদতে লাগলেন। মাথার পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছলেন বসে পড়লেন তিনি।

নামাজ শেষে সবাই চলে গেলেও ইমাম সাহেব মসজিদে শুয়ে রইলেন উপুড় হয়ে।

কৈফি আর তাঁকে বিরক্ত করল না।

[৭]

পরের দিন সকালে ইমাম নিয়ামত হোসেন দক্ষিণাঞ্চলে বেরিয়ে গেলেন তিন দিনের জন্যে। শান্তি, বোটে, পালোয়ার নৌকোয় যাবেন বলে ঘোড়া নিলেন না।

তিনদিন পরে দুপুরে ফিরে শুয়ে পড়ে রইলেন। জ্বর মতো বলে রমজানকে খাবার ফেরত নিয়ে যেতে বললেন

রুকসানা এসে হাজির হলেন খুব সন্তর্পণে—পায়ের শব্দ পায়ে মেরে। ন্যাড়া মাথায় তখন খাবরি চুল ইমামের। দাড়ি ছেঁটে মানান সই করা। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। গড়ানে দুপুরের রোদ এসে পড়েছে খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে মেঝের ওপর। বিছানার ওপরে সোনার গহনা আর কাঁচা টাকা পয়সা বেশ অনেকগুলো!

রুকসানার পা-হাত কাঁপতে লাগল। আলতো ভাবে কপালে হাত রেখে দেখলেন জ্বর খুবই সামান্য। নাক আর চোখ বড় সুন্দর ইমাম সাহেবের। এমনই জোয়ান চেহারা যে চল্লিশ বছর বয়স বললে যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ইমামকে এখন জাগানো ঠিক নয়, তিনি ক্লান্ত, কিছুটা অসুস্থও বটে—তাই মজা করার জন্যে রুকসানা তাঁর ওড়নার প্রান্তে সমস্ত সোনা আর টাকা পয়সা গুলো তুলে নিয়ে চোরের মতোই আবার নেমে এলেন।

আম্মাজানকে সেসব দেখালেন। তিনি তো অবাক। ভিক্ষে করে মানুষ সোনা পায় না চুরি করার লোকও নন ইমাম সাহেব। তাহলে

৭—৪

রুকসানা বললেন, 'কথায় বলে গাঁয়ের ফকির ভিখ পায় না। উনি তো অনেক মানুষের কাছে পীর সাহেব। ওঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে ওঁর সাগরেদরা দক্ষিণ অঞ্চলের নদী-নালা পার হয়ে যায়। হয়তো সাদির কথা জানিয়ে পনেরো ভরি সোনার কথা বলেছেন। জোতদার ভক্তরা এক আধভরি করে দিয়ে দিয়েছে। আগে কিন্তু উনি এসব গ্রহণ করতেন না। নিজেই বরং দিতেন। আহা, বেচারী !'

'তুই এসব দিয়ে আয়—খুঁজে না পেলে ভাববেন, চুরি হয়ে গেছে।' মা বললেন।

'দেখাই যাক না, কি করেন।' রুকসানা হাসতে লাগলেন নিজের চাতুরালীতে মগ্ন হয়ে।

'আসরে'র (বিকালের) আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ইমাম নিয়ামত হোসেনের। তিনি দেয়ালের দিকের বিছানায় তাকাতে দেখলেন গহনা-টাকা-পয়সা কিছুই নেই। উঠে বসলেন তিনি। ভাবতে লাগলেন। রমজান ছাড়া আর কে আসতে পারে ?

রমজানকে ডাকার পর সে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করার পর সে বলল, আমি তো কিছুই জানি না হুজুর। খানা নিয়ে সেই দুপুরে গিয়েছিলাম—আর আসি নি। তবে রুকসানা বিবিজানকে আপনার বাসার দিকে যেতে দেখেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখব ?'

'না, থাক।' মসজিদে নামাজ পড়াতে চলে গেলেন ইমাম সাহেব।

দুদিন তিনি চুপচাপ রইলেন। কাজী সাহেবের কাছ থেকে ফিরে যাবার সময় রুকসানা তাঁকে ডাকল।

'আসুন তো একটু এদিকে।'

'কি বলো, রুকসানা !

'আপনাকে এমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন ?'

'কই না তো !'

'অন্যমনস্ক ?'

'হতে পারে '

'কেন ?'

'আমার বাসা থেকে কিছু জিনিস চুরি হয়ে গেছে।'

'কি জিনিস ?'

'ভরি কয়েক সোনা আর টাকা-পয়সা।'

'কোথায় পেয়েছেন এসব?'

'ভিক্ষা করেছি।'

'ভিক্ষায় কেউ সোনা পায়?'

'আমার সাগরেদরা আমার জন্যে জান পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।'

'সেই সোনা আর টাকা-পয়সা যদি না পান?'

'কি আর হবে, যাঁকে দিতাম তিনি না পেলে কাজ হবে না।'

'কেন আপনি তা দিতে যাবেন?'

'সেটা তো আমারই দায়। নইলে হাত পাতব কেন?'

'দায়টা আপনার কি শুনি?'

'আর কিছুদিন পরেই তা জানতে পারবে। চলি আমি।'

'আপনার জিনিসগুলি আমি এনেছিলাম। নিয়ে যান।'

দাঁতে চাপা মৃদু হাসি হাসলেন ইমাম সাহেব। বললেন, 'রেখে দাও, দরকার হলে চাইব। আমার কাছ থেকে আবার যথার্থ ভাবে খোয়া গেলে তা তোমারই লোকসান হবে।'

'আমার জন্যে ভিক্ষে পর্যন্ত চাইতে পারলেন অথচ একদিনও তো জানালেন না আপনার দিলের মধ্যে আল্লাকে ছাড়া আর কাকেও একবিন্দু দেবার মতো জায়গা ফাঁকা রেখেছিলেন।'

'আমি একজন আশ্রিত মানুষ। হঠকারিতা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি।'

'অশেষ ধন্যবাদ হুজুর, ভেবে দেখবেন এই বাঁদীর সংসার জীবনে এতদিন এত দুঃখ কেন বইলাম—কার জন্যে—তিনি যদি বোধহীন হন আর হীনমন্যতা রোগে ভোগেন তবে কপালের দুঃখ ঘুচবে কিনা। মানুষ একাদিক্রমে ভাল হতে পারে না, কিছু মন্দ তাতে থাকবেই—আপনার সেই মন্দ দিকটা কই? কাকে ভালবেসে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে ধর্মের পথে উৎসর্গ করেছেন? মহৎ হয়ে আমাকে জয় করে নিতে চাইলেন। আপনি খোৎবা পড়াবার সময় আগে তো কখনো কাঁদেন নি?'

'চলি আমি।' নিয়ামত হোসেন ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন।

রুকসানা তাঁকে দেখতে লাগলেন। নিয়ামত হোসেন নিচে নেমে ওপরের দিকে ফিরে তাকাতেই রুকসানা হাত তুলে হাসতে লাগল।

ইমাম সাহেব বাসায় ফিরে ফারসী কিতাব দেওয়ানী হাফিজ নিয়ে পড়তে বসলেন। অনেক কবিতাই তাঁর মুখস্থ।

জানালা দিয়ে দেখলেন ননীর মতো সাদা মেঘের স্তূপ নীলাকাশে সাঁতার কেটে চলেছে। গরু চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। ঝোটনওলা কাঠঠোক্‌রা পাখি বাজ-পড়া নারকেল গাছে ঠকররর্‌র ঠক্—ঠকররর্‌র ঠক্ শব্দ তুলে কোটর খুঁড়ে বাসা বাঁধার আয়োজন করছে।

রুকসানার লাজনম্র কৌতুক আর কৌতূহল মেশানো সুন্দর বিকশিত চোখ দুটির স্মৃতির কথা তাঁর মনে পড়ে। মেহেদির রঙ্গে আঁকা চিত্রকল্প সুন্দর হাত দুটি তাঁর মনের মধ্যে ছবি হয়ে ভাসে।

অনেক সময় কিছুই বুঝতে পারত না রুকসানা—অন্যমনস্কভাবে তাঁর মুখের দিকে কেবল চেয়ে থাকত। বলেছিলেন, 'তোমার আদৌ পড়াশুনোয় মন নেই রুক—এবার তোমার সাদি দিয়ে দিতে বলব।'

রুকসানা পালাবার সময় বলেছিল, 'বলবেন—আপনার সঙ্গে।'

* * *

আস্তাবলে এখনো পাঁচটি ঘোড়া আছে জোলোখাঁ কাজীর। সাতজন বাইরের লোক থাকেন সংসারে। প্রায় তিরিশ জনের পাত পড়ে দু-বেলা। গরুর পাল চরায় রাখাল। গোয়াল আর আস্তাবল পুষ্করিণীর ওপারে। বাগান-বাগিচার দেখা-শোনা করে একজন। দুজন পাচক আর একজন পাচিকা। রমজান আছে সর্বময় সাংসারিক কাজকর্ম আর ফাইফরমাস শোনার জন্যে। ইমাম আছেন।

লাখেরাজ সম্পত্তি সবই আছে ভাগচাষে। চাষীরা যা ধান-খড়-কলাই আনাজ দিয়ে যায় তা আগে পর্যাপ্ত ছিল—এখন বড় সংসারে টান পড়ে। অতিথি কুটুম্ব লেগেই আছে।

শোনাযাচ্ছে সরকারী মাসোহারা এবার বন্ধ করে দেবে ইংরেজরা।

নয় ছেলে, পাঁচ মেয়ের বিয়ে দিতে কত খরচ-খরচা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই—তবে আড়াইশো বিঘে জমি যে বিক্রী করতে হয়েছে সেটা দীর্ঘশ্বাসের মতোই দুঃখকর। পাঁচ ছেলে শ্বশুর বাড়ির তেজারতি দেখেন, তাঁদের স্ত্রী সন্তানাদিও বাইরে থাকে। চার ছেলের প্রত্যেকের তিন-চারটে করে বাচ্চা-কাচ্চা। ছোট ছেলে শাহ আলমের শুধু একটি মেয়ে। শাহ আলম দেওবন্দ

থেকে টাইটেল পাশ করে এসেছেন। ইমামের অবর্তমানে তিনিই মসজিদের ইমামতি করেন।

দুদিন পরে খুব 'ঝুঝকো' বেলায় (উষাকালে) ঘেঁসুড়ে ইয়ার মহম্মদ তিনটে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে দিয়ে সারি দিয়ে কাজী বাড়ির সামনের আঙিনায় পর পর সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে শাহ্ আলম এসে উঠলেন মাঝখানের সাদা ঘোড়াটিতে, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পঞ্চাশটা ঘোড়ার মধ্যে যেটি পর পর তিন বছর প্রথম হয়ে রুপোর কাপ জিতে আসছে। সওয়ারী পিঠে উঠতে ঘোড়াটি হ্রেষাধ্বনি করল। এক চক্কর ঘুরে এলেন শাহ্ আলম।

কালো ঘোড়াটিতে উঠলেন ইমাম সাহেব। ফৈজি সেখ উঠল দেশীয় ছোট আর পাৎলা চেহারার ঘোড়াটিতে। তার কোমরের তবিলের মধ্যে বাঁধা রইল পনেরো ভরি সোনা।

কাজী সাহেব হাত তোলার পর সওয়ারী তিনজন পেটে পা মেরে ইসারা করতেই ঘোড়ারা কদমে কদমে চলতে লাগল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে একটি চওড়া কাঁচা রাস্তা তৈরি হয়েছিল হুগলী নদীর কিনার থেকে কলকাতা পর্যন্ত অবশ্য তা বাখরা হাট পর্যন্ত গিয়ে আমতলার রাস্তায় মিশে যায়। গাজিপুর (ডায়মণ্ডহারবার) রাস্তা তখন পাকা হয়েছে! কেল্লার গাড়িতে সৈন্যসামন্ত যায়।

শাহ্ আলম স্ফূর্তিবাজ লোক। পথ চলতে চলতে নানা রকম গল্প বলেন। সাদা রেশমী চোগার ওপরে মলমলের নকশাদার কাবা তাঁর পরনে। মাথায় তুরস্ক দেশীয় এক ধরণের লম্বা টুপি—তাতে তিনটে পালক গোঁজা। টুপিতে গাঁথা সোনার চাঁদ আর তিনটে তারা। ইমামের পরনে আচকান, মাথায় রুপোর জরির পাড় লাগানো সাদা পাগড়ি। পাগড়িটি গাঁথা হয়েছে রুপোর ময়ূরে।

ফৈজি সেখের পরনে পাঞ্জাবি আর পাজামা। মাথায় মরক্কো দেশী চৈত্তনওলা লাল টুপি।

শাহ্ আলম বললেন, 'সম্রাট বাবর এদেশে যখন থেকে গেলেন, সমস্যা দেখা দিল তাঁর খাবারের জন্য। ফরগানা রাজ্যে খেতেন নান্‌রোটি; কাবাব-কোর্মা, আর নানা রকম মেওয়া ফলের সঙ্গে ঘি মাখিয়ে তৈরি 'আফলাতুন।' তিনি বাবুর্চির সঙ্গে যুক্তি করে দেরাদুনের সরু লম্বা চাল, ঘি-দুধ-দই, খাসী বা

মোরগের মাংস বহুরকমের মশলা কিশমিশ খোরমা আলুবোখরা ডিম ইত্যাদি মিশিয়ে বানালেন বিরিয়ানী। তাতে জাফরানও দেওয়া হত। তোফা খাবার। একাই তলোয়ার দিয়ে একটা বাঘ মারার বীরত্ব প্রকাশ করার পর শের আফগান সম্রাট বাবরের দরবারে আমন্ত্রিত হলেন। বিরিয়ানীতে গোটা খাসীর বড় বড় ধড় আর মাথা বিরাট খাঞ্চায় সাজিয়ে তাঁর সামনে রাখা হলে শের আফগান কেমন করে খাবেন ভাবতে লাগলেন। বাদশাও খেতে বসেছেন দস্তরখানের মাঝখানে। সঙ্গে আছেন আমীর ওমরাহ। তাঁদের পাতে অবশ্য এত বড় আকারের মাংস ছিল না। তাঁরা খেয়ে চলছিলেন। আর বাঘ-মারা খাঁ সাহেবের দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিলেন।

শের আফগান কোমর থেকে তলোয়ার টেনে বার করে মাংস কাটতে লাগলেন। সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। লোকটা বেয়াদপ! খানদানী ঘরের 'পয়দাস, নন। নইলে বাদশা নামদারের সামনে কোন্ স্পর্ধায় তলোয়ার বার করেন?

প্রধান খানসামা তলোয়ার চেপে ধরলে বাদশা সম্মতি দিলেন। বললেন, 'ওঁর উপস্থিত বুদ্ধি আছে!'

এরপর সাসারামের জায়গীরদার হয়ে গেলেন শের আফগান, যিনি পরে শেরশাহ নামে বিখ্যাত ভারত সম্রাট হন।

কিন্তু দিল্লির বাদশারা বহু জিনিস মিশ্রিত বিরিয়ানী খেলেও অযোধ্যার নবাবরা পুলাও বানালেন। তাঁদের ধারণা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য প্রিয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে বড় জাতের পুলাওয়ের কাছে বিরিয়ানী অতিশয় কুৎসিত আর নোংরা। সাধারণত সাত রকম পুলাও এখনো চালু আছে। গুলজার পুলাও, নু-- পুলাও, কোকো পুলাও, মোতী পুলাও, চম্বেলী পুলাও। আবার দানা পুলাও আর নওরতন পুলাও বিখ্যাত। লখণৌয়ের রইস ঘরের দস্তর খানের ওপরে বিভিন্ন কেতার পুলাও থাকত। মহম্মদ আলী শাহর পুত্র মীর্জা আজিম উশসান এক বিয়ের অনুষ্ঠানের অবকাশে 'সমধি মিলাপের' (শ্বশুর বাড়ির কুটুম্বদের সঙ্গে মিলনের) আয়োজন করেন। খোদ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহও ছিলেন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। এই অনুষ্ঠানে দস্তর খানের ওপর ঝাল মিষ্টি মিলিয়ে মোট সত্তর রকমের পুলাও ছিল।

'তকল্লুফ' শব্দের অর্থ সৌজন্য, সামাজিকতা, প্রথা, শিল্পকলা। এই

তকল্লুফের দিক থেকে নিমন্ত্রণ ও তত্ত্ব-তালাশের জন্যে যেসব খানা' সাধারণত নির্দিষ্ট ছিল, তাদের একসঙ্গে বলা হত 'তোরা'। এক একটি 'তোরা'-য় এই সব খাদ্য অপরিহার্য ছিল: (১) পুলাও, (২) মুযাফর (মিষ্টিপুলাও), (৩) মুতঞ্জন (পিঠে পুলাও যাতে টকও দেওয়া হয়), (৪) শীরমাল, (৫) সফেদা (মিষ্টি ভাত যাতে জাফ্‌রানের রং দেওয়া হয় না), (৬) বুরাণীকে (বেগুনের রায়তা) প্যালে, (৭) শীর বিরঞ্জ্-'কে 'খোঁয়াচে, (দুধে রান্না করা চাল, পায়েস). (৮) কোরমা, (৯) তলী লৌঈ অরবিয়াঁ গোশ্‌ত মেঁ, (১০) শামী কাবাব, (১১) মোরব্বা, (১২) আচার বা চাটনী।

সখের খানা পিনা করতেন আর সৌখিন পোষাক পরার আমীর ছিলেন হকীম বান্দা মেহদি। তাঁর বাড়িতে রইস ব্যক্তিরা খেয়ে খুব তারিফ করতেন। একবার এক পালোয়ানও খেতে আসেন। তিনি রোজ সকালে কুড়ি সের দুধ খান, তারপর আড়াই তিনসের মেওয়া অর্থাৎ বাদাম পেশ তা, দুপুরে আর রাত্রে খান আড়াইসের আটার রুটি আর মাঝারি আকারের একটা পাঠা। যেমন আহার তেমন আকৃতি। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন 'নাশতা'র (প্রাতরাশের) জন্যে। তাড়াতাড়ি খানা আনাবার জন্য মুখ ফুটে বললেনও বার বার। সব বুঝেও হকিম সাহেব ব্যস্ততার ভাব দেখালেন না। শেষে, ক্ষিধের চোটে এমন অস্থির হয়ে উঠলেন, বিরক্ত হয়ে উঠেই পড়লেন। হকিম সাহেব 'এক্ষুনি খাবার পাঠাচ্ছি' বলে অন্দর মহলে চলে গেলেন। সেখানে আরো একটু দেরি করলেন। যখন দেখলেন, পালোয়ানজী আর ক্ষিধে সহ্য করতে পারছেন না, গালমন্দ করে চলে যাবেন, তখন দাসীর হাত দিয়ে একটা থালা পাঠিয়ে দিলেন। তাই দেখে পালোয়ানের 'জান মেঁ জান, (ধড়ে প্রাণ)' ফিরে এলো যেন। কিন্তু যখন থালা খুললেন, দেখলেন, একটি ছোট্ট তশ্‌তরী (রেকাবী), তাতে অল্প একটু পুলাও—এক ছটাকের বেশি হবে না বোধ হয়। দেখেই তো ঔদরিক 'মেহমানে'র (অতিথির) খুব 'গোস্বা' (রাগ) হল। এতো এক গ্রাসের পক্ষেও যথেষ্ট নয়! উঠে চলে যাওয়াই স্থির করলেন। সবাই মিলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনো রকমে তো ঠেকালেন তাঁকে। বাধ্য হয়ে পালোয়ানজী সেই পুলাও ক'টি মুখে ঢেলে দিলেন, মুখ না চালিয়েই এক ঢোক মেরে গিলে ফেললেন। পাঁচ মিনিট। পানি চাইলেন। তার পাঁচ মিনিট পরে আবার পানি চাইলেন। ঢেকুর তুললেন। এবার অন্দর

থেকে এলো খাবার থালা। 'দস্তরখান' (পর্দা) বিছানো হল। হকিম সাহেবও এসে পড়লেন। খাবার পরিবেশিত হল। রেকাবীতে করে দেড় পো চালের পুলাও রাখা হ'ল যার এক গ্রাস পালোয়ানকে আগেই দেওয়া হয়েছিল। পালোয়ান পরখ করে দেখলেন একই পুলাও। মাফ চাইলেন আর খাবেন না বলে। তিনি এক গ্রাসেই পরিতৃপ্ত হয়েছেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বে ও পালোয়ান হাত তুলে বাধা দেন আর কেবল পানি খেতে থাকেন। তখন হকিম সাহেব সব পুলাওটুকু খেয়ে নিলেন। বললেন, কুড়িসের ত্রিশ সের খেয়ে খাওয়াটা মানুষের খাদ্য নয়, গরু-মোষের খোরাক। মানুষের খোরাক হল: কয়েক গ্রাস খাবে, তা থেকেই এমন শক্তি-সামর্থ হবে। বিশ-ত্রিশ সের খাদ্য খেয়েও যা হয় না। আজ এক গ্রাসেই তৃপ্ত হয়েছেন, কাল আবার আসবেন।'

দুদিন আর এলেন না পালোয়ানজী। পরে এসে বললেন, 'দুদিন আর কিছু খেতে পারি নি জনাব। কী সাংঘাতিক ঘিয়ের তেজ। এখন শরীরে এমন বল আর উৎসাহ বোধ করছি, যা সারা জীবনেও কোনোদিন বোধ করিনি।'

বেলা নটা বাজার সময় কলকাতার উপকণ্ঠে এসে পড়লেন তিনজন ঘোড় সওয়ারী।

ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, 'পুলাওয়ের কথা তুললেন, ভারতে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আমলে 'পলান্ন' চালু ছিল। পল্ মানে মাংস আর অন্ন বা ভাত—পলান্ন। তবে তার বৈচিত্র্য বাড়ায় মুসলমান বাবুর্চিরা। আনার পুলাওয়ের একপিঠ সাদা এক পিঠ লালচে হত। একটা বাবুর্চির তখনকার বাজারে দু-হাজার টাকা মাইনে ছিল যখন একটা মুরগির দাম ছিল এক পয়সা। এক বাবুর্চি মোতি পুলাও বানালেন ছোলার ডাল থেকে। ছ-সের খাঁটি ঘি ফুটে ফুটে গাদ ফেলে কমলে তা রান্না করলেন নানান কিছু মশলা দিয়ে। কিন্তু নবাবের খাবার সময় হল না। রাগে বাবুর্চি সব এক গাছ তলায় ঢেলে দিয়ে এলেন। পরের দিন জ্যোৎস্না রাতে নবাবের চোখে পড়ল, বললেন, ওখানে মোতির মতো জ্বলজ্বল করে আলো বিস্তার করছে কি জিনিস!'

শাহ আলম বললেন, 'মুসলমানরা এদেশে এনেছেন, ইসলাম ধর্ম-সমাজ-দরবার। আরবীর জ্ঞান। উর্দ্দু ভাষা। কাব্য-কবিতা। মসনবী-মর্সিয়া-ও আসোখ্ত-হযল-রেখ্তি-কিস্সা। গদ্য। পত্র-পত্রিকা। দাস্তান-ফাত্‌বা খিলা—তুক্‌বন্দী—ডাণ্ডেওয়ালা। ফারসী চর্চা। খুশ্‌নবীসী। যুদ্ধ কৌশল।

পশু পাখির লড়াই। ফানুস-ঘুড়ি। নাচ। ভাঁড়ামি। সোখ্‌খোয়ানী। সমবেত বাদ্যবৃন্দ। নানান খাদ্য। বহুরকম বেশভূষা। সাজসজ্জা। জুতা। অলংকার। এসব সমাজ-বৃত্তের মধ্যে পড়ে। আর সংস্কৃতি বৃত্তে: গৃহ। আসবাবপত্র। শালীনতা। অভিবাদন ও কুশল প্রশ্ন। আলাপ-সম্ভাষণ। হাস্য-পরিহাস।

মজলিস, মহফিল, সোহবত। হুঁকো-পান-তামাক। পানদান-খাসদান-উগালদান। সিলফ চা-আবখোর-সুরাহী-লোটা-বদনা। মূর্তিশিল্প স্থাপত্য, কারুশিল্প। আতর-খোশবাঈ গোলাপ পানি। রং চিত্রকলা।'

তাজমহলের নকশার কাজ আজো জগৎ বিখ্যাত! তবে 'সমূহ দুধ' অল্প একটু চোনায় নষ্ট করে দিয়েছে। অশিক্ষা আর চরিত্রহীনতা, রাজন্যবর্গের হঠকারিতা সমস্ত সম্প্রদায়টাকেই ডুবিয়ে দিয়েছে। ভাবুন তাঁর কথা—যাঁর কাছে আমরা শরিয়তের বা আল্লার আইনের বিরুদ্ধে জেনে শুনেই পনেরো ভরি সোনা ঘুষ দিয়ে তিন বছর তালাক-না-দিয়ে ঝুলিয়ে-রাখা একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি।'

শাহ্ আলম বললেন, 'আমার ইচ্ছে করছে তালাক নেবার পর সোনাগুলো দিয়ে তারপর হরদম মারধর করে ও-গুলি কেড়ে নিয়ে চলে আসি।'

ফৈজি বলে ফেলল, 'না সাহেবজাদা, তা করবেন না। আমরা আইনে জড়িয়ে পড়ব। ওঁদের বাড়িতে দিন-দুপুরে ডাকাত পড়ার কেস দিতে পারেন। শয়তানের ছলের অভাব হয় না।'

ইমাম সাহেব হঠাৎ কোমর থেকে খঞ্জর বার করলেন। বললেন, 'কিন্তু আমরা মুসলমান, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করি না।'

ফৈজি বলল, 'দোহাই, খঞ্জর লুকিয়ে ফেলুন, গোরা পলটনরা আসছে।'

বারোজন ঘোড় সওয়ারী সাহেব বেরিয়ে গেল গোটা রাস্তা জুড়ে। এক-পাশে তাঁরা তখন দাঁড়িয়ে রইলেন ঘোড়া থেকে নেমে ঝামেলা এড়াবার জন্যে—নইলে অস্ত্র আর সোনা-টাকা কেড়ে নিতে পারে। উপরন্তু মারধর করতেও পারে।

উল্টোদিকে সাহেবী পল্টন চলে যেতে আবার তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে এগোতে লাগলেন।

ঠিক দুপুর বেলায় এসে হাজির হলেন নবাব লতাফত জাঁ সাহেবের বাড়ির সামনে।

তিনজন ঘোড় সওয়ারকে দেখে খাঁ-বাড়ির দোতলার বারান্দায় লোকজনের কৌতূহল দেখা গেল।

মেয়েরা 'উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলেন।

লতাফত সাহেব সালাম গ্রহণের পর ফৈজিকে চিনতে পেরে বৈঠকখানায় বসালেন।

ফৈজি বলল, 'হজরত, আপনার পুত্র নবাবজাদা গোলাম কুদ্দুস খাঁর কাছে আমরা এসেছি তাঁর দাবি মিটিয়ে জনাবে আলা জোলায় খাঁ কাজীর কন্যা রুকসানা বেগমের তালাক নিতে।'

'আপনারা দূর থেকে এসেছেন, একটু বিশ্রাম নিন, নাস্তাপানি করুন—উনি আসবেন।'

ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, 'নাস্তা বা আহারের কোনো প্রয়োজন নেই নবাব বাহাদুর। ব্যস্ত হবেন না।'

লতাফত সাহেব ওপরে উঠে গেলেন।

তিন চারজন সাহেবজাদী বৈঠকখানা ঘরের জানালার পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে শাহ আলম আর ইমাম সাহেবকে দেখছিলেন। তাঁদের খিলখিল হাসির চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্যদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করলে বোধ হয় নবাব বংশের আভিজাত্য বাঁচে না।

কুদ্দিস সাহেব নেমে এলেন।

ফৈজি সেখ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানাল। বলল, 'আপনার দাবি মতো আমরা পনেরো ভরি সোনা এনেছি হজরত—এই যে দেখুন—আপনি এই তালাকনামাটা পড়ে দেখে সই করে দিলেই সোনা গুলো দিয়ে দেবো। তারপর আপনি উচ্চারণ করে তিনবার তালাকনামাটা পড়ে দেবেন। দুজন সাক্ষীও দরকার।'

'দিন আপনাদের তালাকনামাটা।' বললেন কুদ্দুস সাহেব।

ফৈজি তা হাতে ধরিয়ে দিতে পড়ে দেখার পর সই করে দিলেন।

তখনি সোনার গহনাগুলো চৌপায়ার ওপরে তহ্‌বিল থেকে ঢেলে দিল ফৈজি মিয়া।

'ঠিক ওজন আছে তো?'

'পনেরো ভরির সামান্য একটু বেশি আছে। ওজন করে দেখতে পারেন।'

নাস্তাপানি এসে হাজির হল। নবাবের তিনজন অনূঢ়া কন্যাও এসে ভাইজানের পাশে বসলেন।

তাঁদের চোখে-মুখে রুমাল চাপা হাসি। কুৎকুতে চোখ। মাখনের মতো মুখের মাংস পেশী ফোলা আর নরম। ব্যাঙের মুখের মতো ঢোলা মুখমণ্ডল। পরনে সালোয়ার কামিজ ওড়না-বোরখার বালাই নেই।

শাহ আলম ওদের দিকে তাকিয়ে হাসির কারণ জানতে চাইলে তাঁদের একজন ফৈজি সেখের মরক্কো টুপির চৈতন নাড়া দেখালেন। মাথা ঘোরানোর অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা ভেতরের হাসির উৎসকে দমন করে। ফৈজির মৌচাক ঝোলা দাড়ি আর পোষাকও তাঁদের উপভোগ্য বিষয় হয়েছিল।

লতাফত সাহেব এসে বললেন, 'আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তাপানি করে নিন।'

ইমাম সাহেব হাত তুলে জানালেন ঠিক আছে। কুদ্দুস সাহেব আব্বাজানকে আড়াল করে সোনার গহনাগুলি তাকিয়ার নিচে চেপে রেখে তালাকনামাটা পড়তে লাগলেন :

'আমি নবাব লতাফত হোসেন জাঁ সাহেবের তৃতীয় পুত্র গোলাম কুদ্দুস জাঁ, ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক জনাব জোলায় খাঁ কাজীর কনিষ্ঠা কন্যা বেগম রুকসানাকে সাদি করিয়া ছিলাম। এক্ষনে উক্ত পত্নীর সহিত আমার মনোমিল না হওয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ মাথায় কোনোরূপ চাপের কাছে নতি স্বীকার না করিয়া আমার পত্নী বেগম রুকসানাকে এক তালাক—দুই তালাক—তিন তালাক দিলাম। এবং তাঁহার জীবনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব হইতে তাহাকে চির দিনের জন্য খালাস দিলাম। তাঁর নিজের ইচ্ছায় তিনি অন্য যে কোনো পুরুষের সহিত পুনর্বার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন, ইহাতে আমার কোনো রকম আপত্তি রহিল না।

তাঁহার পক্ষ হইতে আমার উপর আর কোনো কিছুই দাবি রইল না।

স্বাক্ষর

গোলাম কুদ্দুস জাঁ

সাক্ষী, তারিখ এবং ঠিকানা।

তিনবার উচ্চারণ করে পড়ার পর কুদ্দুস সাহেব তালাকনামাটা দিয়ে দিলেন।

'আপনারা নাস্তা করুন!' লতাফত সাহেব জানালেন।

ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, 'হুজুরে আলা আপনি একটা সই করে দিন সাক্ষী হিসাবে।'

লতাফত সাহেব সই করে দিলেন।

'আর একজন কেউ।'

আজিম হোসেন নামের এক চাচাজানকে ডাকতে তিনি এসে সই করে দিলেন।

'আপনারা খাবেন না?' লতাফত সাহেব করুন মিনতির স্বরে বললেন।

নিয়ামত হোসেন বললেন, 'পাপ করা আর পাপের সাক্ষী থাকা তুল্যমূল্য ব্যাপার। জ্ঞানত জীবনে আমি গুনাহ্ বা পাপ করিনি কিন্তু আজ একটা অন্যায় কাজের সাক্ষী হয়ে গেলাম। যে খানদানী বাড়িতে শরিয়েতর প্রাপ্য দাবিকে নস্যাং করে উল্টো চাপের ফলে কন্যা পক্ষকে সোনা দিয়ে যেতে হল সেখানে আহার্য গ্রহণ ইমাম হয়ে করতে গেলে মসজিদের মিম্বারে আর খাড়া হতে পারব কি?'

কুকুরকে ফেলে দাও ওসব!' বলে সোনাগুলো চোগার জেবে পুরে নিয়ে চলে গেলেন কুদ্দুস সাহেব। তিন বোনও তাঁর পিছু নিলেন।

শাহ্ আলমও উঠে পড়েছিলেন। বললেন, 'ঐ সোনাগুলো যদি সৎকাজে লাগে ভাল, নচেৎ মন্দকাজে ব্যয় হলে আল্লাহ্ অবশ্য বিচার করবেন। ভায়ে ভায়ে বিবাদ করে নবাবরা ইংরেজদের হাতে রাজ্য তুলে দিয়েছেন। আমি অন্যায় করছি, আমি এমন কেউ নয়, একথা ইসলামের একজন ব্যক্তিও যদি ভাবেন বা করেন তবে সেই পরিচয়ই সম্প্রদায়ের বুকে ছুরি বসায়। শরিয়তকে আপনার পুত্র পদদলিত করলে শরিয়তও পাল্টা জবাব দিতে পারে। একজনের লোভ-লালসার অপরাধ অন্য জনকেও লালায়িত করে, সমাজে এই ভাবে ধস্ নামে। আর একের অপরাধে বহুজন কষ্টভোগ করে, এটাও বড় দুঃখের। তবু ধন্যবাদ রইল আমার বোনের জীবন এখন রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেল।'

লতাফত সাহেব বললেন, 'যে ছেলের জন্যে বাপের সম্মান নিচু হয় তা জুতো খাওয়ারও বিশগুণ বাপ! আমি এখন অক্ষম—আমার অন্তরের দুঃখটার কথাও বুঝে দেখো।'

শাহ আলম বৃদ্ধ নবাবের পায়ে 'কদমবুসি' করল। নবাব বুকে চেপে ধরে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন।

তিনজন ঘোড়ায় উঠে নবাব বাড়ির দিকে পিছন ফিরলেন। গড়ানো দুপুরের গলি-কাটা রোদ তাঁদের মুখের ওপর পড়তে লাগল গাছপালার ভেতর দিয়ে।

খিদিরপুর অঞ্চলে এসে মসজিদ দেখে তাঁরা ঘোড়া দাঁড করিয়ে রেখে। ওজু করে জোহরের নামাজ আদায় করার পর শাহ আলম বললেন, 'পেট জ্বলছে ভুখে—আসুন ইমাম সাহেব, এই হোটেলটায় গ্রহনযোগ্য লঘুপাক কোনো খাদ্য পাওয়া যায় যদি খেয়ে নিই।'

বিরিয়নী পাওয়া গেল।

খাবার সময় কথা কহতে নেই। দু-পাত্র করে এক একজন বিরিয়ানী খেলেন। ঝাল-মশলা তেমন কিছু ছিল না। তবে আলাদা চাঁপ মাংস নিতে হল খাদি'র।

শাহ আলম্ নিজের জেব থেকে একটা সোনার গিনি ভাঙিয়ে টাকা দিলেন হোটেলের।

বিকালের দিকে তাঁরা ঘোড ছুটিয়ে চললেন কদমে কদমে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি সময়ে যখন মগরেবের আজান হচ্ছে তখন এসে দাঁড়ালেন কাজী বাড়ির সামনে।

কাজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তাঁরা। অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন না তিনি।

কথাবার্তা শেষ করার পর কাজী বাড়িতেই ফৈজি সেখ, শাহ আলম, কাজী সাহেব আর ইমাম সাহেব একটি বড় খাঞ্চায় একসঙ্গে খেতে বসলেন।

আহারাদির পর ফৈজি সেখ বলল কাজী সাহেবকে, 'আপনার মতো মানুষও আমার মতো অধম লোকের সঙ্গে একপাতে খেলেন, এটাতেই আশ্চর্য হচ্ছি।'

কাজী সাহেব বললেন, 'ইসলাম এটাই শিখেয়েছে। সব মানুষই আল্লার তৈরি। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান সে কালো অথবা সাদা কিম্বা হলদে—গোঁড়া লম্বা মোটা রোগা যাই হোক এক সাথে একপাত্রে আহার গ্রহণ করলে পুণ্য হয়। অবশ্য রোগীর জন্য আলাদা ব্যবস্থা।'

—'আচ্ছা হুজুর' পুনর্জন্ম বাদ কি ঠিক?'

হাসলেন কাজী সাহেব। বললেন, 'ইসলাম জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী নয়। ইসলামে বলা হয়েছে—মৃত্যুর পর যখন কবর দেওয়া হয়—তিনমুঠো মাটি ধরে কি বলা হয় ভাবো, তোমাকে এই মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছিল, আবার এই মাটিতে ফিরিয়ে আনা হল, পুনরায় তোমাকে এই মাটি থেকে তোলা হবে।—এই যে শেষ বেলাকার পুনরোত্থান এটা কিন্তু মানুষ রূপে বা অন্যরূপে পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য নয়—কর্মফলের বিচারের জন্য।'

ফৈজি বলল, 'সমাজ-শাসনের জন্য এটাও তো একরকম কল্পনা নাস্তিকজনে বলতে পারে? শুধু আল্লার বাণী বলে ইমানদাররা না হয় মেনে নিল।'

হেসে উঠে হঠাৎ দুম্ করে পিঠে ফৈজির একঘা চাপড় কষালেন ইমাম সাহেব। বললেন, ডিম আগে না মুরগি আগে এ তর্কে তোমার মাথা এখন গুলিয়ে দিতে হয়। ইসলাম কয়েকটি স্তম্ভের ওপর খাড়া হয়ে আছে। কলেমা নামাজ, রোজা, হজ আর যাকাত। সবার মূলে আছে ইমান বা বিশ্বাস। ইহকাল, পরকাল, বেহেস্ত, দোজখ, পাপ, পুণ্য আর রুহ বা আত্মায় বিশ্বাস রাখতেই হবে, যদি মুসলমান হতে চাও।'

ফৈজি বলল, 'আপনার কথায় আবার রুহ বা আত্মার কথা এলো। জন্মান্তর হবে না কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর এটাও তো ধর্মের মহা গেঁড়াকল!'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হয় এটাই তো ধর্মের মূল ধ্যান-ধারণা। নইলে আত্মার সাধনা বা সিদ্ধিলাভ কিসের? পশুজীবন থেকে উৎকৃষ্ট বা সাংস্কৃতিক হবার দরকার কি? এসব বিষয়ে গভীর তত্ত্ব আছে, দর্শন আছে, পড়াশুনো করতে হয়।'

'দোহাই ইমাম সাহেব, ধামা চাপা দেবেন না। হিন্দুদের স্বাধীন চিন্তা—যে যেভাবে ডাকে ডাকুক—কৃষ্ণকে গাধার উল্টে পিঠে চাপিয়ে কোনো সাধক ভজনা করলেও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু ইসলামের বাঁধা-ধরা গণ্ডির বাইরে চিন্তা নিষিদ্ধ। কাজেই তা দর্শন নয়। দর্শন শেষ পর্যন্ত তর্ক চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু ইসলামে তা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্ কোথা থেকে হয়েছেন এটা নিষিদ্ধ প্রশ্ন। এর উত্তর নেই। বলা হয়েছে তিনি কারণও নন, জন্যও নন। কেউ তাঁর জন্মদাতা নেই, তিনি মৃত্যুরও অধীন নন। আবার তিনি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু দুটি কাজ করতে পারেন না, এক, নিজের

মতো আর একজন আল্লাহ্‌ তিনি তৈরি করতে পারেন না, আর দুই হল, নিজেকে ধ্বংসও করতে পারেন না। আল্লাহ্‌ নিজে থাকেন রহস্যমণ্ডিত, দুর্জ্ঞেয় অবস্থায় অথচ মানুষদের বলেন সরল সোজা পথে চলো। আমরা সোজা পথে সরল ভাবে চলব কি করে যদি লক্ষ্যবস্তু আলো আঁধারীতে থেকে যায়?'

ইমাম সাহেব অবাক হলেন। ফৈজি সেখ এ সব তত্ত্ব কথা পেল কোথা থেকে? পড়াশুনো করেও। বললেন, 'আল্লাকে জানা আর তাঁকে লাভ করাই শেষ সাধনা। তোমার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যখন তখন আরো পড়াশুনো করো। কাজী সাহেবের কুতুবখানায় অনেক বই আছে। চষা জমিতে বীজ বুনলেই তবে ফসল ভাল ফলে। অনাবাদী জমিতে জন্মায় ঘাস-আগাছ-কাঁটা গাছ। ছোট হয়ে বড়র বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে বড় হও। সরল বিশ্বাস হারিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পাক খেলে শয়তান তোমাকে খেলনা বানাবে।'

কাজী সাহেব বললেন, 'কথাটা ঠিক। পথ অতিক্রম করো, বয়স হোক, জ্ঞান বাড়ুক, সমাধান পাবে।'

ফৈজি বলল, 'মানুষের জন্য ধর্ম তৈরি হয়েছে, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। ধর্মের জন্য মানুষ হলে তা স্বার্থসিদ্ধি বা ব্যবসায় পরিণত হয়। সে রকম হলে মুসলমানদের মধ্যে পীরের অপগণ্ড ছেলেও পীর সেজে সমাজকে গোল্লায় দেবে।'

ইমাম বললেন, 'এটা ইসলামের পথ নয়। হজরত মোহম্মদ (দঃ) শেষ নবী,—তবে জগতে অনেক পীর, ওলি-আউলিয়া-বোজর্গ ব্যক্তি এসেছেন ও আসবেন। তাঁদের বংশ পরম্পরা নেই। যাঁরা এসব দাবি করে আর পূর্ব-পুরুষদের মাজার পুজো করে বিনা শ্রমে মুনাফা তোলে তারাই ইসলামের প্রধান শত্রু।

ফৈজি সেখ সালাম জানিয়ে বিদায় নিল।

ইমামও চলে এলেন তার সঙ্গে।

ফৈজি বলল, 'এবার আপনার সাদির দিন ঠিক করুন। আমরা একটা জবরদস্ত খানা খাই।'

ইমাম বললেন, 'ঈশার নামাজটা মসজিদেই পড়ে যাও।'

নামাজ শেষ করে যখন ফৈজি সেখ বাড়ি যাবার জন্যে অন্ধকারে কেমন করে

যাবে—যদি পাড়া-গাঁয়ের হাটুরে আলপথে সাপে কাটে ভাবছিল তখন একজন লোককে আলো নিয়ে আসতে দেখা গেল।

শুধোলে 'কে গো, কোথায় যাবে ?'

লোকটি বলল, 'আমি প্রশান্ত মালিক, কে রমানাথ ? আমি ভাই মোদা-খালীর খোয়াড়ওলা রহিম গাড়োয়ানের বাড়ি গেছিলুম। তোমাদের পাড়ায় খলিল মোল্লা আমার গাইগরুটাকে হরদম মারপিট করে খোড়া করে খোয়াড়ে দিয়ে এসেছে। দড়িছিঁড়ে গিয়ে নাকি গাছপালা খেয়ে ফেলেছে। কোমরে বাছুর আছে বাড়িতে, খুব হামলাচ্চে। রহিম খুব জোর খেসারতি আদায় করতে চায়। খলিল নাকি দু-টাকা পেয়েছে—তাই তিনটাকা চায়। অতো পয়সা নিয়ে যায়নি। আর রাতকালে নিয়ে আসতে রহিম বারণ করল। খোঁড়া গরু ! চলো বাড়ি যাবে তো ?'

'আমি আলো আনি নি। ভোর বেলায় বেরিয়েছি। ঘোড়ায় চড়ে কলকাতায় গেছিলুম।'

'তুমি তো মুসলমান হয়ে—কাজী বাড়ির দয়ায় জায়গা-জমিও পেলে। বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে নিলে। ভালই আছ এখন, কি বলো ?'

'হাঁ ভাই, আল্লাহ আমাকে পথ দেখিয়েছেন।'—কিন্তু মা হিন্দু বাপ মুসলমান যাদের তাদের হিন্দুরা 'নেড়ে' বলে অবজ্ঞা করে জানোতো !'

ফৈজি বলল, 'নেড়ে' বলে অবজ্ঞা শুধু তার জন্মের জন্য নয় বোধহয়, কর্মদোষও এর মূলে আছে। এইসব লোকরা না হয়েছে মুসলমান, না হয়েছে হিন্দু। এরা ওলাবিবি, বনবিবি, বড়কান গাজির থান পুজো করে। নামাজ পড়তে জানে না। লেখাপড়াও শেখে না। খৎনা বা 'মুসলমানী', বিয়ের অনুষ্ঠানে বাড়িতে ঢোল বাজায়। ঝগড়া-মারামারি-মামলা করে। বউকে মারে—মেরে ফেলে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেয়। জেল খাটে। হরদম বউ তালাক দেয় আর নিকে-সাদি করে। মা-বাপকে খেতে দেয় না, তারা ভিক্ষে করতে বাধ্য হয়। তাই হিন্দুরা এদের স্বভাব-চরিত্র দেখেই 'নেড়ে বলে থাকে। তবে জন্মের জন্য দায়ী নয় কেউ। তাকে মন্দ কথা শোনানোও ঠিক নয়। কুমারী কুন্তি মায়ের গর্ভে জন্মেও কর্ণ, মরিয়মতনয় হজরত ঈশা (আঃ)—আরো কতজন বড় মানুষ হয়েছেন।'

'সাবধান, রমানাথ—লতা !' আলো হাতে নিয়ে পেছিয়ে এলো প্রশান্ত।

ফণা তুলে পথের মাঝখানে তখন একটি পদ্ম গোখরো ফোঁস ফোঁস শুরু করে দিয়েছে। চোখে আলো পড়ার জন্য বোধহয় বিভ্রান্ত হয়েছে পুরোনো বড় আকারের সাপটি।

ফৈজি সাপ দেখলেই মারবে। তাই বেড়ার জিউলি কচা টান মেরে উপড়ে নিয়েই দু-পা এগিয়ে গিয়ে মারল পটাস করে গায়ের জোরে। সাপটার কোমর ভেঙে গিয়ে আর পালাতে পারল না। ঘা কতক পিটিয়ে মেরে ফেলে বাবলা গাছের ওপর ঝুলিয়ে দিল ফৈজি।

প্রশান্ত মালিক বলল, 'দেখ ভাই, কার হাতে কার মরণ থাকে। অন্ধকারে আগে যদি তুমি গোঁ ভরে চলে আসতে তবে হয়তো এই কালের মুখের ছোবল খেয়ে শেষ হতে। কিন্তু আলো ছিল বলে তোমার হাতেই ওটা মরল।'

প্রশান্ত মালিক অন্য পথে চলে গেল।

এবার মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে ওলাবিবির থানের ভিটের বাড়িতে যাবার সময় যেন আতঙ্ক ধরে গেল ফৈজির মনে। সে আর পা তুলতে পারল না।

বাবুরালি সেখ দলিজে তখনো পিঁদিম জ্বেলে ঝ্যাৎলা বুনছিল। সারা বাদা ঢুঁড়ে আশ্বিন-কার্তিক মাসে সে ধানবন থেকে পাতি ঘাস কেটে এনে সঞ্চয় করে সারা বছর ঝ্যাৎলা বুনে বেচে সংসার চালায়। তার কাছে গিয়ে সাপ মারার কথা বলে দু-আঁটি খড় চেয়ে নিয়ে জ্বেলে বাঁশ আর কলাবন গলে গলে বাড়িতে এসে যেন প্রাণে বাঁচল। এক সপ্তা এখন তার আতঙ্ক থাকবে।

স্বর্ণ তখন গভীর ঘুমে অচেতন। অনেকবার ডাকাডাকির পর দোর খুলে আলো নিয়ে বাইরে বেরুল। বলল, 'জেগে জেগে খেজুর পাতার চাটাই বুনছিলুম, হঠাৎ ঘুমিয়ে গেলুম গো! এত রাত করে আস কেন? অন্ধকার রাত!'

'কেউটে সাপের পাল্লায় যা পড়েছিলুম—প্রশান্ত মালিকের আলোয় না এলে প্রাণ যেত বোধহয় আজকেই। আল্লা বাঁচানেওয়ালা!'

ফৈজি সেখ আলো নিয়ে গা-হাত ধুয়ে এলে তাকে খাবার দিতে গেল আসমা।

ফৈজি বলল, 'খেয়ে এসেছি কাজীবাড়ি থেকে। দারুণ বিরিয়ানী রান্না। হোটেলেও বিরিয়ানী খেয়েছি দুপুরে। কাজী সাহেবের মতো লোকও আমার সঙ্গে আজ এক পাতে খেলেন।'

'কাজী সাহেবের জামাই তালাক দিয়ে দিয়েছে?'

'হুঁ।'

'তাহলে রুকসানার এবার বিয়ে হবে ইমাম সাহেবের সঙ্গে।'

'ইমাম সাহেব তো নীরব।'

স্বর্ণ আবার শুয়ে পড়ল। ছেলের মুখে চুমো খেয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে সে মাকে জড়িয়ে ধরল। আসমা বলল, 'চল্লিশ বছর বয়সে কি জ্ঞানী লোকের ভেতরে আনন্দ-উল্লাস থাকে?'

ঘুমোবার জন্যে চোখ বন্ধ করল ফৈজি কিন্তু সারাদিনের ঘটমান চিত্রগুলি মনের পর্দায় আবার ভেসে যেতে লাগল। বারোজন ঘোড়ায় চাপা গোরা সৈন্য—নবাববাড়ির চিত্র—শেষ পর্যন্ত সাপের ফণা দুলতে লাগল।

বাইরে তখন খট্টাশ ডাকার শব্দ ওঠে, বাপ! বাপ! বাপ। বাপ! তুষ! তুষ!'

বামুন বাড়িতে কোনো একটা গাই খণ্ডেছে। মাঝে মাঝে ডাকছে। প্রকৃতির ডাক এটা।

ফৈজির নাক ডাকতে থাকলেও স্বর্ণর চোখে আর সহজে ঘুম আসে না।

যদি সাপে কাটত কি হত ভেবে স্বামীর বুকে মাথায় হাত বুলোয়। হাতপাখা টেনে বাতাস করে। তারপর এক সময় যখন তার চোখে তন্দ্রা নেমে এসেছে তখন হঠাৎ জোর চেঁচামেচি শুনতে পায় দূরের পল্লী থেকে। উঠে পড়ে পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে দেখল আকাশ জোড়া আলো—কার ঘরে আগুন লেগেছে।

স্বামীকে আর ডাকল না। ডাকলেই ছুটে যাবে সে অন্ধকার মাঠ ভেঙে।

চারদিক সচেতন হয়ে উঠেছে—লোকজন হাঁক মেরে ছুটে যাচ্ছে।

আসমা তবু ডাকল না স্বামীকে। বামুনবাড়ি থেকে হৈ চৈ শোনা গেল কিন্তু ওঁরা বোধহয় কেউ যাবেন না।

ঝগড়া-ফাসাদ যাই করুক মুসলমান পাড়ায় সব পুরুষই ছুটে যাচ্ছে আগুন নেভাতে।

[৮]

আব্বাজান অসুস্থ শুনে কাজী জোলো খাঁর পুত্ররা যে যেখানে ছিলেন বাড়িতে এসে জড়ো হলেন।

বড় বিবি নসীমন বেগমের চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, চোখেও কম দেখেন। তিনি দোতলার মূল বাড়িটার ঘরগুলোয় থাকতেন দুই ছেলে দুই মেয়েকে নিয়ে।

দুই ছেলে শাহজামাল আর শাহ আদিল ছেলেমেয়ে আর বিবি সমেত এসেছেন। দুই মেয়ে তাঁদের স্বামী পুত্রকন্যাসহ এসে উঠেছেন।

শ্যামাঙ্গী কাঁচাপাকা চুল মেজো বিবি রহিমন বেগমের তিন ছেলে শাহ আকতার, শাহ মাহমুদ, শাহ সুলতান। এঁদেরও বিবি আর পুত্র কন্যারা হাজির। জামাইটি বিখ্যাত বারুদের পটকা-আতসবাজি ব্যবসায়ী।

সেজো বিবি আঞ্জুমন বেগম খুব বেঁটে না হলেও বেশ মোটাসোটা বলে শালোয়ার কামিজে তাঁকে খাটোই দেখায়। তিন ছেলে শাহ আবদুর রহিম, শাহ আবদুল লতিফ, শাহ আবদুর রাজ্জাক। কেবল লতিফ সাহেব লাট অঞ্চলের জোতদার মুন্সী বাড়িতে থেকে সুন্দরবনের মধু আর গরান-সুঁদরি-আল্-বানি অর্জুন কাঠের ব্যবসা করেন। আর দু-ভাই বাড়িতেই থাকেন। এক কন্যা বেগম রোকেয়া নারকেল-খড়-বাঁশ-সুপারি ব্যবসায়ীর স্ত্রী।

পশ্চিমদিকের বাড়িগুলিতে থাকেন ছোট বিবি বিলকিস বেগম। কটা বিড়াল চোখ তাঁর। ফরসা রঙ। দিল্লির সুলতান বাড়ির মেয়ে। আগে বাংলা বলতেই পারতেন না। উর্দু বলেন। ফারসী ভাষায় বিদুষী। চমৎকার গজল গাইতে পারেন। তাঁর এক ছেলে শাহ আলম। এক কন্যা রুকসানা বেগম। শাহ আলম মাত্র বছর দুই আগে মুর্শিদাবাদের এক নবাব বাড়ির কন্যাকে বিয়ে করার পর এক কন্যার জনক হয়েছেন। ঘোড়া ছোটাতে ওস্তাদ। আব্বাজানের তিন সের ওজনের তিন হাত লম্বা তলোয়ার তিনিই ঘোরাতে পারেন। মহরমের সময় কাজী বাড়ি থেকে বহু রকম অস্ত্র বেরিয়ে আসে। কাজী সাহেব নিজে সুন্নী সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদের নবাব মীরকাশিমের বংশের কন্যা বড়বিবি নসিমন বেগমকে সাদি করার জন্য গামারা করতে হুকুম দিয়েছিলেন। চাম্‌সের মাঠে জড়ো হওয়া একশো তাজিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য আর উঁচু তাঁদেরই। কিন্তু ছোট বিবিকে দিল্লির সুলতান বাড়ি থেকে আনার পর তা বন্ধ হয়ে গেল। বিদুষী বিলকিস বেগম জানালেন, গামারা করা উচিত নয়। সীমরের দল হজরত ইমাম হোসেনের মস্তক ছিন্ন করে বল্লমে গেঁথে পৈশাচিক নৃত্য করতে করতে এলে খলিফা এজিদ ভয় পান। মুসলমানরা বিদ্রোহ করবে। তাই বললেন, ধরে আনতে বলেছিলাম, তোমরা শিরছিন্ন করে এনেছ!—খলিফা বিরূপ দেখে সীমারের দল ছল করে সব কিছু ঢাকা দেবার জন্যে শোক মিছিল বার করল। তারা হায় হোসেন হায় হোসেন বলে বুক চাপড়াতে লাগল। বাজি-বাজনা করে যুদ্ধের সাজে কারবালায় চলল ইমামের লাস খুঁজে দাফন করার জন্য।

গামারার মাথায় যে গোলাকার প্রতীকটি থাকে ঐটিই ইমামের মস্তক। প্রতীকীকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। সীমারের দলবলরাই পরে শিয়াদের সঙ্গে হাত মেলায়— শিয়া তারাই যারা একমাত্র হজরত আলীকেই ন্যায্য খলিফা বলে মনে করতেন আর অন্য বহুজন মুসলমানের মধ্যে বিভেদ আনে। কারবালার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইমামের নাবালক পুত্র জয়নাল আবেদিনকে সরিয়ে নিয়ে একজন পলাতক হলে তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। শেষ খলিফা হিসাবে তাঁর নামেই নমাজের পর খোৎবা পড়া হয়। তাঁর বংশধররাই ছিলেন সৈয়দ।

ইমাম নিয়ামত হোসেন আসার পর ছোট বেগমের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। গামারা বন্ধ হয়ে গেল। ছোট বেগমের ওপরে বড় বেগমের রাগ হল। সেই থেকে কুড়ি বছর তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই।

অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত কাজী জোলো খাঁর শরীর দামী রেশমী চাদরে ঢাকা।

গোটা হলঘরের মেঝেয় গালিচা পেতে কোরআন শরীফ পাঠ করছেন মেয়েরা অনেকেই।

ছেলেরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। জামাইরা বৈষয়িক কথায় যোগ না দিয়ে কোরআন শরীফ পাঠে নিমগ্ন। ইমাম সাহেব ফৈজি আর তিনজন মোল্লা আছেন তাঁদের মধ্যে। তিরিশ অধ্যায় কোরআন শরীফের অংশ বিশেষ ভাগ করে দিয়েছেন তাঁদের ইমাম সাহেব। খতম পড়া হচ্ছে।

শাহ আলম বাদে আট ছেলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের নামে ছোলা পড়তে বসেছেন।

শাহ আলম সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করছেন। রুকসানা আর ছোট বেগম কাজী সাহেবের পাশে বসে চোখের জল মুছতে মুছতে রুপোর চামচে করে মক্কার আবেজমজম কূপ থেকে আনানো পবিত্র পানি গালে দিচ্ছেন।

হঠাৎ কাজী সাহেবের ঘাড় ঘুরে গেল একবার মাত্র চোখ মেলে রুকসানা আর তাঁর মায়ের মুখ দেখার পর।

বড়বিবি এসে আছড়ে পড়লেন পায়ের ওপর। চিৎকার করে কাঁদতে থাকলে তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে হুকুম করলেন শাহ আলম। বললেন, কেউ চিৎকার করে কাঁদবেন না। আল্লার দোহাই। মানুষ কেউ চিরকাল পৃথিবীতে বাচতে আসে না। 'নেকি'র (পুণ্যের) কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে গুণাহগার' (পাপী) হবেন না।'

কাজী সাহেবের শেষ কথা ছিল, 'হায় মুসলমান, যে হজরত মোহম্মদ (সাল্লে আলয়ে আলাহে সাল্লাম) প্রতিটি মুসলমান তাঁর উম্মতের জন্য 'ইয়া উম্মতি, ইয়া

উর্ধ্মতি' ডাক ফুঁ করাচ্ছেন কবরের মধ্যে সেই উন্মত্ত তাঁর জন্ম মৃত্যু দিন ফতেয়াজ দোয়াজদাহম বা বিশ্বনবী দিবসের খোঁজ রাখে না। অথচ মহররমের গামারা নিয়ে হৈ-হল্লা করে।'

ইমাম সাহেব বলেছিলেন, 'আমরা প্রতিবছর বিশ্বনবী দিবস পালন করব।'

'তুমি আমার কন্যা রুকসানা বেগমকে সাদি করবে?'

'জী।'

'আলাহাম্‌দো শিল্লাহ।'

আর কোনো কথা বলেন নি কাজী জোলো খাঁ। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

অজ্ঞান অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন প্রায় দশ ঘণ্টা। ঠিক বেলা দশটার সময় তার প্রাণবায়ু চলে গেল।

চারদিক থেকে বিভিন্ন গ্রামের হাজার দুয়েক লোককে নিয়ে কাজী সাহেবের পূর্ব পুরুষদের কবরখানা আগে 'জিয়ারত' করা হল।

কবর খোঁড়া হতে লাগল।

গরম জল করে সাবান দিয়ে কাজী সাহেবের লাসকে 'গোসল' (স্নান) দেওয়া হল একটা পর্দা ঘেরা জায়গার মধ্যে। পেটের ময়লা পর্যন্ত চেপে বার করে দেওয়া হয় এ সময়।

গোসলের জল বারান্দা বেয়ে ঝিরঝির করে এসে পড়ছে একটা গামলায়। সেদিকে তাকিয়ে রুকসানা বেগম কাঁদতে থাকেন। তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তার মাও কাঁদছেন ঘরের মধ্যে পাগলের মতো। শিয়ারা 'মূর্দা'কে গোসল খানায় (কলঘরে) নিয়ে যায়। সুন্নী বাড়ির শবকে বাড়ির বারান্দায় ডেগ হাঁড়িতে জল গরম করার পর অভিজ্ঞ লোক দিয়ে ধোয়ানো হয়। ইমাম বা মোল্লা নির্দেশ দেন। মহিলাদের গোসল অভিজ্ঞ মহিলারাই দেয়। সেখানে পুরুষরা কেউ যায় না।

স্নানের পর তের গজ নতুন সাদা থান কপড় এনে 'কফ্‌ন্' বা কাফন তৈরি করেন মৌলভী লোক। কাফনের সুতো দিয়েই খেল্‌কা, পীরহান, চাদর, শিরস্ত্রান ইত্যাদি তৈরি করা হয় ফালি ফেড়ে ফেলে। কুর্তার মতো 'কফ্‌নী' দুটো চাদর জড়ানো হয়। মাথা, পায়ের কাছে আর কোমরে কাপড়ের টুকরো বেঁধে দেওয়া হয় যাতে না খুলে যায়।

'শিয়াদের লাস একটা বাক্সে রেখে, তার ওপরে দোশলা দিয়ে ঢেকে শামিয়ানার ছায়ায়-ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যে কোনো একজন সুরাহ্‌ আর

রহমান-এর কয়েকটি 'আয়াত' বা শ্লোক শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পড়তে যান। 'শুহদ' বলে তাদের যারা এই বাক্স ওঠায়—মুর্দা ওঠানোই যাদের দীর্ঘদিনের পেশা কিন্তু এদের আচরণ বড়ই অভব্য। তাই শিয়ারা নিজেদেরই মুর্দা ওঠানো ভালো মনে করেন। এজন্য শহরে নানা কমিটি গড়ে উঠেছে। হাসপাতালের লাসও তাঁরা শরিয়ত মোতাবেক দাফন করেন।

সুন্নীরা 'ম্যইয়ত' (মৃতদেহ)-কে একটা হাল্কা কাঠের চার পাইয়ে শুইয়ে চাদর ঢেকে নিয়ে যান। নারীর লাস হলে চ্যাচাড়ি ধনুকের মতো বাঁকিয়ে, দু-মাথা চারপাইয়ে আটকে তার ওপরে চাদর ঢেকে দেন। একে বলে 'গওভরা' (দোলনা)। এটা এসেছে নারীর পর্দা হিসাবে। সুন্নীদের আত্মীয়-স্বজনরাই লাস কাঁধের ওপর নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটার সময় কলেমা পড়েন। তারপর পরিষ্কার এক জায়গায় লাস উত্তর মুখী করে নামিয়ে জানাজা নামাজ পড়েন। ইমাম্ বা মোল্লা জানাজা পড়ান। (প্রবাদ আছে জীবন্ত ব্যক্তিকে এই ভাবে শুইয়ে) জানাজা পড়া হলে সে নাকি মারা যায়।

'কবর' খোঁড়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই দু-জন বা চার জন মিলে। মানুষের এক বুক নিচ পর্যন্ত কবর খোঁড়া হয় সাড়ে তিন হাত বা মৃতের পায়ের ন-পা মেপে নিয়ে। দুই পাশে আর সামনে পিছনে কিছু নিচুতে থাক কেটে বাঁশ বসানোর জন্য 'পাড়ন' করা হয়। দুজন লোক কবরে নেমে যান। মাথার দিকে থাকেন কেতাব-কায়দা পাঠ করা লোক। লাস নামানো হয় খুব সতর্কভাবে ধীরে ধীরে। ধরে নিয়ে উত্তর মুখী করে মৃতদেহকে শুইয়ে মুখটা একটি মাটির ঢেলার তলায় রেখে 'কাবামুখী' (ভারত থেকে পশ্চিমে) করে দেয়া হয়। বাঁধন খুলে মুখের আবরণ তুলে শেষবারের মতো দুনিয়াদারীকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। আত্মীয়রা শেষবারের জন্য মৃতের মুখখানা দেখে নেনও। এই সময় শিয়ারা পড়েন 'তিল্‌কীন্‌' (সদুপদেশ)। কোনো সদাচারী বৃদ্ধ যিনি আগেই কবরের 'সিথেনে' (মাথার দিকে) নেমেছেন (পায়ের দিকে লোক লাস কবরে নামানোর পরেই দু'হাতে ভর রেখে শূন্যে উঠে আসেন) তিনি মৃতব্যক্তির কাঁধ ধরে ঝাঁকানী দেন আর একটি আরবী 'ইবারত' (লিখন) পড়ে দেন দুই কাঁধের ফেরেস্তা মনকীর ও নকীর এসে যখন প্রশ্ন শুধোবে তার এই-এই জবাব দেবেন। তারপর বৃদ্ধ উঠে আসেন। কর্পূর আতর গোলাপজল লাসের দেহে ব্যবহার করা হয়। মাঝখানে আড়ের পাড়ন দেবার পর এবার লম্বা

লম্বা কাঁচা মাপসই বাঁশের পাড়ন গায়ে গায়ে বসানো হয়। কোনো কোনো জায়গায় বাঁশ না থাকলে কাঠও ব্যবহার করা হয়। সাবধান থাকা হয়, কবরের মধ্যে মাটি না পড়ে। আড়ের দিকে ছোট ছোট বাঁশ কাঠ তির্যকভাবে বসানোর পর তালপাতা বা খড় বিছিয়ে কবরের ওপর দেওয়ার জন্য সবাই মুঠো ভরে মাটি ধরেন। পরপর তিন মুঠো মাটি দেবার সময় আরবীতে যা বলা হয় তার বাংলা হল : (১) 'আমি তোমাকে এই (মাটি) থেকে জন্ম দিয়েছি; (২) আমি তোমাকে আবার এখানেই (এই মাটিতেই) পৌঁছে দিলাম; (৩) আমি তোমাকে আবার ভবিষ্যতে (কেয়ামতের দিন) তোমাকে এখান থেকে বার করে দাঁড় করিয়ে দেবো।'

কবর যখন মাটি কোদাল বা হাত দিয়ে টেনে উঁচু করে তৈরী করা হয়ে যায়—এক ঘড়া জল মাথার দিক থেকে পা পর্যন্ত ধীরে ধীরে ঢেলে দেওয় হয়। যাতে বালি হলেও না ওড়ে—মাটি হলে তা কিছুটা এঁটে যায়। কোনো জায়গায় কবরের ওপর চাদর বিছানো হয়। চারকোনে চারটে খেজুর পাতা পোঁতার সময় চারজন বিভিন্ন সুরার আয়াত পড়েন।

এরপর সবাই বাইরে এসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ মতো নানান সুরার বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঁচবার, দশবার ইত্যাদি করে পড়ার পর ইমাম প্রার্থনা করেন। কাঁদতেও থাকেন। কবরখানার সমস্ত লাস যাতে 'রোজ হাসরের' ময়দানে নিজেদের কৃত গুনাহ থেকে মুক্তি পান তার জন্য আল্লার কাছে করুণা ভিক্ষা করেন।

সকল লোকই তখন 'ইয়া আমীন' বলেন।

এরপর গোটা কবরখানায় গোলাপ জল ছিটিয়ে আসা হয়।

সরকারী বা ষোলআনার গোরস্থানে কবর বাঁধানোর নিয়ম নেই। আরবে রাজা-বাদশাদের কবরের ওপরে একটা লম্বা পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়—যাতে বালি উড়ে না যায়।

পাকা কবর গড়তে হলে কেনা বা নিজের জায়গায় তা করতে হয়।

যে-ঘরে মৃত্যুর আবির্ভাব হয়েছে, সে-ঘরে আর সেদিন উনুন জ্বলে না। লাস কাফন পরিয়ে খাটে তুলে বেরিয়ে গেলেই মেয়েরা বুক চাপড়ে, কপাল ঠুকে জোর কান্না-কাটি করেন।

কান্না থামাতে পারেন না যখন মুখের ওপর কাপড় চেপে ধরা হয়।

'মরহুম' (মৃত) জোলো খাঁ কাজীর বড় বিবি নসীমন বেগম সুর করে পাঁচালী গাওয়ার মতো কাঁদছিলেন :

'ওগো আমার ছুনিয়ার মালিক
ওগো আমার আখেরাতের সঙ্গী
তুমি আমায় কোথায় বসিয়ে রেখে গেলে গো—
আমাকে তুমি কার ভরসায় রেখে গেলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেজোবিবি রহিমন বেগমের গলার স্বর হাঁসা বা পুরুষ হাঁসের মতো ফ্যাঁস-ফেঁসে হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিলাপ করছিলেন নিজের ঘরের মধ্যে। তুজন দাসী তাঁকে ধরেছিল। এলো মাথায় পা ছড়িয়ে বসে তিনি বাখানী গাইছিলেন :

তোমার রহিমনকে 'কালো বেগম' বলে আর কে ডাকবে—
কে ডাকবে গো 'কোয়েলা বিবি' বলে—
তোমার কবরে উঠেছে কান্না—
তুনিয়াদারীর মায়া তোমার ছিল এতো
কোথায় সে সব পড়ে রইলো গো—

সেজোবিবি আজুমন বেগম মোটা শরীর নিয়ে লাদাড়ি গেয়ে গেয়ে কাঁদ-ছিলেন নিজের ঘরের মধ্যে হাতের চুড়ি গায়ের গহনা সব খুলে ফেলে মাথার চুল এলিয়ে পা ছড়িয়ে মেঝেয় বসে।

তুমি চলে গেছ 'কোকাফের' (মেরু অন্ধকারের) ওপারে
সাগর পেরিয়ে চলে গেল সোনার তরী
তোমার আরবী অক্ষরের কিতাব
হিজিবিজি হয়ে গেল
কে পড়তে পারে এখন তা—
তোমার পন্খীরাজ আসমান পেরিয়ে
চলে গেল বেহেস্তে।...

আজুমানের মুখে কাপড়ের হুটি চেপে ধরে তাঁর ছোট বউমা। শান্ত হলেও কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন আজুমান বেগম। গোসল খানায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল।

কাজী সাহেবের মৃত্যু ছোট বিবি বিলকিস বেগমের সামনেই ঘটেছে। মৃত্যুর পর লাস চাদর ঢাকা হয়ে গেলে তিনি টলতে টলতে নিজের কামরায় এসে মেঝেয় বসে পড়লেন। গায়ের গহনা হাতের চুড়ি খুলে রাখলেন। তারের

বাজনা বাজিয়ে তিনি মর্সিয়া গাইতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে। উর্দু ভাষার সেই মরমী গান শুনে রুকসানা আর শাহ আলমের স্ত্রীও কাঁদতে লাগল।

বড় মেজো সেজো বেগমের গোসল করানো, তাদের সাদা পোষাক পরানো হলে ছোট বিবিকে বাজনা ছাড়িয়ে গান থামিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় ঘড়াভরা ঠাণ্ডা জল ঢালা হল।

তাঁকে সাদা রেশমী কাপড় পরানো হলে রুকসানাকে দেখেই আবার কেঁদে উঠলেন।

কাজী বাগানের চৌহদ্দির বাইরে ছিল গড়। পশ্চিমে সেতু পেরিয়ে মসজিদ। পুবপারের দেওয়ান আলিমদ্দী, দক্ষিণ পারের হাসিম মুফ্‌তি, উত্তর পারের নওয়াজ মুন্সির বাড়ি থেকে খানাপিনা এলো।

সারি দিয়ে বসিয়ে একদিকে পুরুষদের অন্য মহলে মহিলাদের খাওয়ালেন তাঁরা। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়।

রাত্রে সবায়ের সামনে টাকাকড়ি গহনাগাঁটির গাছসিন্দুক খোলা হল। মেঝেয় ঢালা হল সেসব। চারদিকে মোমবাতি জ্বলতে লাগল। সোনা-রুপোগুলো জ্বল জ্বল করছে।

এত সোনা ছিল অথচ কাজী সাহেব পাঁচভরি সোনা কোথা থেকে যোগাড় হবে রুকসানার তালাকের ব্যাপারে তা কেন যে ভাবিত করেছিল নিয়ামত হোসেন আজ ভেবে কূল পান না।

জামাইরা আর সব ছেলেই বখরার ভার দিলেন ইমাম নিয়ামত হোসেনকে।

তিনি বললেন, 'এ বড় শক্ত কাজ। আপনারা নিজেরাই হিসেব করে নিন।'

শাহ আলম বললেন, 'আমি একটা আর্জি পেশ করতে চাই। আব্বাজানের চল্লিশরোজের 'খানা' আর ইমাম নিয়ামত হোসেনের সঙ্গে রুকসানার সাদীর খরচ প্রথম এই যৌথ টাকা বা সোনা-রুপো থেকে করা হবে। আব্বাজান আর কিছুকাল জীবিত থাকলে রুকসানার বিয়ের কাজ সমাধা হতো।'

সবাই নীরব রইলেন।

বড় বেগম বললেন, 'তাই হবে।'

সবাই মেনে নিলেন।

তিন হাজার টাকা আলাদা করে রাখা হল শোককৃত্যের জন্য বড় বেগমের কাছে।

আর তিন হাজার টাকা, পঁচিশ ভরি সোনা, পঞ্চাশ ভরি রুপোর গহনা বড়বিবি রুকসানার বিয়ের জন্য ছোট বেগমকে তুলে নিতে বললেন। বিশ বছর পর তিনি আজ ছোট সতীনের সঙ্গে কথা বললেন।

ইমাম সাহেব বললেন, 'এবার পাল্লা ধরে চার হিস্যা হবে। জমির মতো এ বখরা না হওয়াই ভাল। তাতে ফারাজের কুটকচালি এসে পড়ে। যে যার বখরা থেকে মা, আর ভাইবোনদের দিয়ে দেবেন।'

সবাই তা মেনে নিলেন।

পাল্লা ধরে চার বখরা হবার পর যে যার ভাগ তুলে নিয়ে গেলেন।

এবার জমি বখরার কথা উঠল।

ছোটবিবি বললেন, 'এখনি জমির বখরা নিন্দনীয় হবে। 'চল্লিশে' বা শোক-উৎসব আর বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সেসব বখরা হবে। এখনি এখানে বসে সব জমির হিসেবও মিলবে না। চাষীদের ডাকতে হবে। দলিলও পড়ে রাখতে হবে।'

সবাই সেকথা মেনে নিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

শাহআলম নিয়ামত হোসেনকে নিজেদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন। বললেন, আজকেই আমি আমার বোন রুকসনাকে আপনার হাতে সোপর্দ করব। এটা প্রাথমিক বিবাহ। পরে সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানই হবে।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'না। তিনদিন পরে।'

শাহআলমকে তাঁর আম্মাজানও সেরকম বললেন। তিনদিন শোক বাড়িতে যখন উনুন জ্বালাই নিষিদ্ধ তখন আনন্দজনক বিবাহের সম্প্রদানই বা হবে কি করে?

শাহ আলম বললেন, 'এটা তো প্রতিশ্রুতি মাত্র। অনন্দজনক কিছু কাজ করা হবে না। শুধু আব্বাজানের ইচ্ছা পূর্ণ করার ওয়াদা।'

ছোট বেগম আর ইমাম চুপ করে রইলেন। অতএব মৌনং সম্মতি লক্ষণম।

সমস্ত ভাই আর জামাইদের ডাকা হল।

তাঁদের কৌতূহল হল, হঠাৎ আবার কি ঘটনা ঘটতে চলল?

সকলকে গালিচা পেতে বসানো হল।

শাহআলম বললেন, 'আজ আনন্দের দিন নয় বলে রুকসনার সাদির জন্য কোনো রকম ক্রিয়াকাণ্ড না করলেও শুধু সকলের সমনে আমরা তাকে ইমাম নিয়ামত হোসেনের হাতে সোপর্দ করতে চাই। আর তিনি সদয় হয়ে কবুল করে নেবেন।'

রুকসনাকে আর সাজগোজ করানো হল না—হাত ধরে আনলেন তাঁকে শাহআলম। ইমামের ডান হাত খানা ধরে সেই হাতের ওপর রুকসনার বাঁ হাত রাখলেন। 'বললেন, আমার বোন রুকসনার সব রকম দায়-দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি মরহুম পিতার ইচ্ছায় তাকে আপনার হাতে আজ সোপর্দ করলাম।'

ইমাম নতমস্তকে বললেন, 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্‌—আমি কবুল করলাম।'

বসে হাত তুলে মোনাজাত (প্রার্থনা) শুরু করলেন শাহ্‌ আলম। সবাই হাত তুললেন। নারীরা পর্যন্ত।

এক জামাই এসে বললেন, 'তালাকের পর তিনমাস দশ দিন ইদ্দৎ পালনের বিধান আছে—সেটা তো দেখা হল না।'

শাহ আলম বললেন, 'এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়—তিনবছর ছাড়াছাড়ি—গর্ভে সন্তান থাকার প্রশ্নে এই সময়টা দেখতে হয়। সন্তান থাকলেও পূর্বতন স্বামী তার ভরণপোষণের ভার নেবেন। ইমাম সেজন্যই ইদ্দৎপালনের প্রশ্ন তুললেন না।'

কেউ আর কোনো কথা না তুলে যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ইমাম সাহেব গেলেন মসজিদে।

নামাজ পড়ানোর পর নিজের বাসায় ফিরে এলেন একরাত একদিনের পর। কাজী সাহেবের জন্য শোককৃত করতে এতটা সময় কেটে গেছে।

শুয়ে পড়ার পর স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন।

হঠাৎ মনে পড়ল, ফৈজিসেখ কোথায়—সে কি কাজী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কবর দিতে এসেছিল ?

হঠাৎ মনে পড়ল হাঁ এসেছিল—খতম পড়েছে সে মৌলবীদের সঙ্গে বসে।

তাকে কিছু জমি দেবার কথা বলে গেছেন কাজী সাহেব। শাহ আলমের হক থেকে তা দিয়ে দেবার কথা বলবেন। অথবা রুকসনার হক থেকে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা তাঁর মুক্তির জন্য সেই প্রথম মদতদার।

[৯]

প্রশান্ত মালিকের গাইগরুটি আরো কয়েকদিন খোঁয়াড়ে পড়ে থাকার পর নাকি বিনা আহারে আর চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে। রাত পার হলেই খোঁয়াড়ওলা গরুর খোরাকী আর সেবার জন্য প্রতিদিন একটাকা জরিমানা দাবি করে। রাগে প্রশান্ত মালিক আর গরু আনে নি।

এখন গরু মারা যাবার পর প্রশান্ত মালিক আর তার ভাই বা ছেলেরা লাঠিসোটা নিয়ে মাঠ দিয়ে নেমে এসে খলিল মোল্লাকে মারতে এলে তারাও লাঠি-সোটা বার করে। জোর চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়।

ফৈজি সেখ ছুটে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-দলকেই হটিয়ে দিল। বলল, 'সালিসিতে বসো সবাই। মারামারি খুনোখুনি করে লাভ হবে না। দু-পক্ষেরই আরো ক্ষতি হবে।'

প্রশান্ত মালিক বলে, 'আমরা বদলা চাই। গরু ফসল খেয়েছে খেসারত দাবি করতে পারে—তাকে পিটিয়ে খোঁড়া করে খোঁয়াড়ে দিয়ে মারলে কেন?'

সালিসি সভা বসল একদিন সাতগাছিয়া গ্রামের ঝাঁপতলার মাঠে। চেয়ার টেবিল পেতে চকমানিক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল বিচারের হাকিম হলেন। শতখানেক লোক জমা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সবাই আছে।

আগে চকমানিক বর্ধিষ্ণু গ্রামের শীতল মিত্র ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু দশটি গ্রামের উত্তর প্রান্তের চকমকানি গ্রাম একপ্রান্তে—যদিও পাকা রাস্তার ধারে—অনেক পাকাবাড়ি আর জমিদার-নায়েব-গোমস্তাদের পাড়া সেখানে, তবু দূরে যাতায়াতের অসুবিধায় দক্ষিণাঞ্চলের অশিক্ষিত চাষীবাসীরা জোট পাকিয়ে ধক্কেবেড়িয়া গ্রামের বি-এ পাশ নমঃশুদ্রের ছেলে প্রবোধ মণ্ডলকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেয়।

প্রবোধ মণ্ডল বিশটা গ্রামের মধ্যে তখন একমাত্র বি-এ পাশ ব্যক্তি। সরকারের গেজেটেড অফিসার। দুশো টাকা মাসে মাইনে তাঁর।

খলিল মোল্লা বললে, 'আমার গাছপালা খেয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল বাবু। গরুকে ধরে আমরা খোঁড়ে দিয়েছিলুম। মারিনি!'

প্রবোধবাবু বললেন, 'গরু তাহলে খোঁড়া হল কি করে? গরুকে মারতে কেউ দেখেছে?

খলিলের পাশের বাড়ীর লোক কেউ আছে?'

প্রশান্ত মালিক বললে, 'ঐ যে বলাই সেখ, কানাই সেখ আছে।'

বলাই সেখ বলল, 'হক কথা বলব মুই বাবু, যা চোখে দেখিচি। কারু হয়ে মুই বলবুনি কো। গরুকে ধরে খলিল মোল্লা একটা গাছে বাঁধে। তারপর হরদম পচাল পেড়ে গাল দিতে দিতে লাঠি দিয়ে সোঁটাতে থাকলে গাইটা গাঁক গাঁক করে আছাড় কাছাড় খেতে থাকে—ছ্যারায়। আণ্ডা আণ্ডা চোখ বেরিয়ে পড়ে। ঠ্যাংয়ে মেরে খোঁড়া করে দেবার পর টেনে টেনে বৈকেল বেলায় খোঁড়ে দিতে আসে।'

রহিম গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, জখমী গরু, মারের চোটে গা-হাত ফুলে ছিল। পা খোঁড়াচ্ছিল বলে রাতকালে মুই প্রশান্ত মালিককে গরু লেস্‌তে নিষেধ করি।'

প্রশান্ত মালিক বলে, 'গরু আনতে যেতে তিন টাকা কেন 'চার্জো' করল?'

রহিম বলল, 'ফসল তছরুপের জন্যে এই খেসারত দিতে হবে না?'

'তারপর রাত্রে গরু না দিয়ে সকালে যেতেই রাতের খোরাকী আর সেবার জন্যে আর একটাকা দাবি করলে?'

'করবই তো। যতদিন থাকবে ততটাকা চার্জো। খোঁড় জমা লিতে সরকার টাকা লেয় নি? যদি গরু না ছারায়, বেওয়ারিশ গরু বলে একমাস পরে আমি লিলেমে (নীলামে) বেচে দিতেও পারি।'

হাকিম শুধোলেন, তা গরুটা মরল কেন? খাবার নাকি কিছু দেওয়া হয়নি? শূন্য গড়ায় টাঙানো ছিল আর চিকিৎসাও হয়নি?'

রহিম বলল, 'এসব বাজে কথা।'

'যাক গে, এই খলিল মোল্লাকে এই গরুর খেসারত দিতে হবে পুরোটাই কারণ ফসল তছরুপের জন্য গরুকে খোঁয়াড়ে দেবার অধিকার তার আছে ঠিকই কিন্তু মেরে জখম করার অধিকার তাকে কেউ দেয়নি। আর না মারলে গরুটা মরত না। রহিম সাহেবের চাতুরি হয়েছে প্রথম সন্ধ্যাতে গরুকে পাওনা-গণ্ডা বেশি হবার আশায় আটকে রাখাটা। অসুস্থ গরু দিয়ে যেতে পারবে না রাতকালে এই দয়ার কথাটা কিন্তু ছলনা। কেননা রাত পেরুলেই বেশি পাওনা হবে। প্রশান্ত মালিক বোধহয় তা জানতেন না বা খেয়ালও করেন নি। আর প্রশান্ত

মালিকও যে গরু নিয়ে যাবেন না, কতদিন রাখে রাখুক—এই গোঁ ধরার ফলে —গরুটা রহিম সাহেবের উত্তম চিকিৎসা ও সেবায় মারা যাবে—এটাও রহিম সাহেব ধারণা করতে পারেন নি।' বললেন প্রবোধ মণ্ডল।

প্রায় কেঁদে উঠে কপালে হাত মেরে প্রশান্ত হঠাৎ বলে উঠল, 'এইমাত্র খবর এলো হুজুর, বাছুরটাও মারা গেছে।' প্রশান্ত মালিক থেবড়ে মাটিতে বসে পড়ল।

হাকিম শুধোলেন, 'গরুর দাম কত হতে পারে প্রশান্তবাবু, আর বাছুরের দাম?'

দু-সের ন-পো দুধ হতো আমার গরুর—দাম—তা একশো পঁচিশ টাকা হবে। আর বকনা বাছুরের দাম পঞ্চাশ টাকা'

'তার মানে একশো পঁচাত্তর টাকা এখন খেসারত দিতে হবে খলিল মোল্লাকে। নচেৎ আমি চৌকিদার দিয়ে বেঁধে থানায় পাঠাব। কেস দিয়ে দেবো।'

খলিল মোল্লা এসে হাকিমের পায়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'অতটাকা কোথা পাব হুজুর?'

'জমি বেচে দিন, যে জমির ফসল তছরুপ হয়েছিল—এক বিঘের দাম এখন দেড়শো টাকা—আগে একশো টাকা ছিল।'

'ও জমি তো মোর বাস্তুভিটে বাপজান ভাইদের সঙ্গে এজমালি জমি।'

'তবে জেল খেটে আসুন মাস ছয়েক। যখন রাগ হয় তখন জ্ঞান থাকে না? অবলা জীবকে কেন ঐরকম করে মারলে? তোমার প্রাণে একটু দয়ামায়া নেই?'

একজন বলে উঠল, 'হুজুর ওর চারটে বউ মারের চোটে পাইলে গ্যাছেন—কাউকে 'তাল্লাক' দেয় নি বলে তেনাদের নিকেও হচ্ছে না। তারা ভিক্ষে করে খাচ্ছে। এইসব লোক দেশে ভিখারী বাড়ায়।'

'আপনি বউকেও মারেন?'

খলিল মোল্লার খণ্ড-তয়ের মতো দাড়িটার ওপরের পাঁচের আকারের মুখখানা একটু ভাংচুর হল। লালচে গোলগোল চোখ দুটো সে সাক্ষী দুজনের দিকে ঘোরাল। কিছুই বলল না।

'এটা ক'নম্বরের বউ-যে এখন আছে?'

খলিল বলল, 'ন নম্বরের হুজুর।'

'আর ক'টা বিয়ে করবে ?'

'সেটা আল্লার হাত !'

হাকিম টেবিলে কীল্ মেরে চিৎকার করে বললেন, 'না। সেটা তোমার হাত। আল্লার নামে তোমার নিজের অপরাধ তুলে দিচ্ছ কেন ? চৌকিদার বাঁধো এঁকে। থানায় নিয়ে যাও। আর আমি লিখে দিচ্ছি ভাল করে একটু রোগ নামাবার জন্যে।'

খলিল মোল্লার তাড়ির নেশা তখনো ভাল করে কাটে নি। চৌকিদার হাসান মল্লিক তাকে বাঁধতে গেলে সে বিক্রম দেখিয়ে বলল, 'খবরদার আমাকে বাঁধবে না চৌকিদার। আমি গরুচোর নয়—আর গরুকে কেটে খেয়েও নিইনি।'

'চুপ করে বস, ব্যাটা শুয়োরের নাড়ীভুঁড়ি !' চেঁচিয়ে উঠে চৌকিদার তার পিঠে সজোরে এক চাপড় বসালে। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললে কোমরে। নিয়ে চলে গেল থানায়। প্রবোধবাবু তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন।

লোকজন সবাই চলে গেল।

কিন্তু সেখান থেকে ফৈজিসেখ আলমপুর গাঁয়ের ঘরপোড়া দেখে যখন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল আস্‌মা জানাল, তাদের গাইগরুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশে চারদিকের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছে।

'কোথায় যাবে গরু ?'

'সন্ধ্যার আগে মাঠ থেকে আনতে গিয়ে দেখি গাইটা নেই। বাছুর বাঁধা আছে। একা মেয়েমানুষ আর অন্তকার রাতের বেলা ঘর ফেলে কদ্দুর খোঁজ নিতে যাব ?'

তোমার বাপের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছ ?'

'হুঁ। ওদের গোয়ালে যায় নি।'

হাতে লণ্ঠন নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রাত দশটার সময় গরুর হদিস মিলল —চকদৌলতের মঙ্গলা চরণ মান্নার বাড়ির গোয়াল ঘরে বাঁধা আছে।

মান্না বুড়ি বলল, 'গরুটা এসে আমাদে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাম্বা রব ছাড়ল বাবা! গাছপালা কিছু খেয়ে দিয়েছে ঘরের পেছনের ডাঙায়। অবলাজীব খেয়ে ফেলেছে, কি করব ? তা কপাল ভাল না হলে এমন্ সাদা ভরাট চেহারার লক্ষী গাই একেবারে 'বাকুলে' আসে ? তা বাবা গায়ে হাত দিতেও কিছু বলে না। গোয়ালে তুলে খড় ভুঁষি খোল দিয়ে জাবনা দিলুম। কত

গায়ে হাত বুলোলুম। আহা এমন গাই যদি আমাদের হতো! তা হ্যাঁ বাবা, এখনি নিয়ে যাবে? রাতকাল, থাক না। মা লক্ষ্মী এলো ঘরে—সকালে নিয়ে যাবে।'

মঙ্গলা মান্না বলল, 'গরু অবলা জন্তু—মোছলমানেরই বা কি আর হিন্দুরই বা কি! হাজার ফসল নষ্ট করলেও আমরা কারো গরু-ঘোড়া-ছাগল-ভেঁড়া খোঁয়াড়ে দিই না।'

পায়ে হাত দিয়ে বুড়িমাকে গড় করে ফৈজি মিয়া গরু নিয়ে এসে আসমাকে বলল, 'খুব যত্নে ছিল এক বুড়ি মায়ের কাছে। মোটে দিতে চায় নি। কত আদর!'

'মারেনি তো?'

জিভের একটা শব্দ করল ফৈজি মিয়া, যাতে বোঝায় 'না' এটা তুমি কি বলছ! হিন্দুরা গরুকে দেবতুল্য জ্ঞান করে তার কাছ থেকে কাজ আর উপকার পায় বলে। দুধ আর গোবর মানুষের হাজার উপকারে লাগে।'

খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার পর ফৈজি মিয়া ভাবতে লাগল। তার মন বললে মনুষ্যত্বটাই হল আসল ধর্ম। খারাপ কাজ করার সময় বিবেক বাধা দেয়, কিন্তু সেই বিবেককে হত্যা করলে সেও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না।

তবে একটা ব্যাপার সে কিছুতেই ভেবে পায় না। মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় বাজ পড়েই বা কেন আর আগুন লাগলে ভগবান্, আল্লা বা গড সর্বশক্তিমান হয়েও সেসব রক্ষা করেন না কেন?

আবার দেখা যায়, প্রচণ্ড ঝড়ে পাঁচওয়াক্ত নামাজী সৎ গরিব মানুষটির ভুঁইকুড়ে উড়ে গেল। আর দুশ্চরিত্র-পাপী-সুদখোর-মদ্যপ বে-নামাজী লোকটার পাকাবাড়ির কোনোই ক্ষতি হল না! আল্লার বিচার বোঝা কঠিন।

বোরহানপুরের আলীহোসেন নামের এক উচ্চ শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে ফৈজি সেখের পরিচয় হয়েছিল মুসলমান জোলাদের কাছে গামছা মশারী কেনার সময়। আলীহোসেনকে দারুণ সুন্দর দেখতে। যেমন সরল তীক্ষ্ণ নাক তেমনি বিকশিত পদ্মপলাশ চোখ। সে কিন্তু মুসলমান লোকগুলোর কথাবার্তা, ধরণধারণ, চেহারা, পোষাক দেখে যেন নিজের মনেই বেশ একটা মজা উপভোগ করছিলে। হাসছিল তার রাঙা ঠোঁট আর চোখ দুটো। হঠাৎ বলল, 'তোমরা একদল বোকা আর অন্যের হাতের পুতুল। বিশ্বাস আর ধর্মের যেসব কথা বলছিল তা আরোপিত। মানুষ আগে হয়েছে তারপর ঈশ্বর নামক একটা আইডিয়াল

ধারণার সৃষ্টি করেছে—তাকে কেন্দ্র করে চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো আবর্তিত হচ্ছে। যে যতবার ঘুরবে ততই পুণ্য। মরার পর কিছুই তোমাদের সঙ্গে যাবে না।'

মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল। কিছুক্ষণ লোকগুলো কলবল করল। তারপর জোলাদের একজন বলল, 'ও একটা পাগল! ফৈজিভাই ওর কথা শুনো না। শয়তানের কাছে ও ওর আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে।'

ফৈজি সেখ মাহাত মেয়েদের গায়ে উল্কি দেখে তাদের নক্‌শাপ্রিয়তার কথাই ভেবেছিল কিন্তু আসল সত্যটা যদি অন্যরকম হয়? তাই চুল-পাকা মজবুত চেহারার এক বয়স্ক মেয়েকে শুধোল, "ও দিদি, তোমার গায়ে এত উল্কি কেন?"

মাহাত মেয়েটি বলল, 'দেহাতী মেয়ে! ছোটকালে দিল। খুব জ্বালা করল। বলল মরার পর সঙ্গে কি লিয়ে যাবে?'

ফৈজি মজা পেয়ে বলল, 'মরার পর তাহলে ওগুলো তোমার সঙ্গে যাবে? চিতায় তুলে পুড়ালেও থাকবে? এসব সংস্কার।'

আলী হোসেনের কথার হিসেব ধরলে তাহলে তো দাড়ি-টিকি-পৈতে রাখাও সংস্কার।

সংস্কার নানান দেশে নানান রকম। সমতলভূমিতে এক রকম তো পাহাড়ী এলাকায় আর এক রকম। মরুভূমির প্রবল তাপ প্রবাহের তাত বাঁচানোর জন্যে যে আলখাল্লা-চোগা-পীরহান-বোরখা দরকার বাংলার সমভূমির শীতল হাওয়ায় তা প্রয়োজন না থকলেও কেন তা অন্ধের মতো ব্যবহার করবে?'

আলী হোসেনের কথা ফৈজি মিয়ার ধর্মবিশ্বাসে যেন ফাটল ধরিয়ে দেয়।

ইমাম নিয়ামত হোসেন একদিন বলেছিলেন, আরবে কেউ চোর নেই। আজান হলেই সোনার দোকান পর্যন্ত খোলা ফেলে রেখে পুরুষ মানুষরা মসজিদে চলে যায় নামাজ পড়তে। শুধু একটা লাল সুতো সামনে টেনে দিয়ে যায়। চুরি করলে রাজ-আইনে ডান হাত কাটা যায়।

আলী হোসেনের কাছে এ প্রসঙ্গটি তুলতে সে বলল, 'লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ও বিচারসম্মত নয়। আরবে এখন তিনলক্ষ মাত্র লোক, আমাদের দেশ থেকে দশ কোটি লোক 'বারো' করে নিয়ে গিয়ে রাখুক, তিনমাস না যেতে যেতেই দেখবে চুরি হচ্ছে। অভাব থেকে স্বভাব খারাপ হয়। যেদেশে অভাব নেই চোরের সংখ্যা এমনিতেই কম হয়।'

[১০]

কাজী সাহেবের মৃত্যুকালীন 'চল্লিশের খানায়' ফৈজিরও দাওত (নিমন্ত্রণ) হয়েছিল। আস্‌মা আর ফতেহারকে নিয়ে গেল সে। আস্‌মা প্রথমে যেতে চায়নি। দ্বীপের মাঝখানে ঘরদোর পড়ে থাকবে। গরু-বাছুর হাঁস-মুরগী আছে। তাই ওপাড়ার আয়মন বিবিকে এক কুনকে (পাঁচপোয়া) চাল দেবার কথা বলে খেজুর পাতার চাটাই বুনতে বসিয়ে দিয়ে আসে।

ফৈজি বলল, আর একটা ব্যাপারও আছে। আমাকে স্বধর্মে আনার জন্যে পুরুষরা খাওয়া-দাওয়ার সময় উদার হলেও, যাঁদের হাতে ধর্মের অনুষ্ঠানদির গোঁড়ামী সেই মেয়েরা কি রকম ব্যবহার করেন, সেটাই আমি দেখতে চাই।'

আসমা বলল, 'তারপর তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে বস্ত্রহরণের সময় যে রকম যুধিষ্ঠির করেছিলেন তেমনি মৌনী হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?'

'না। দেখবে তখন, তোমাকে নিয়ে চলে আসব।'

খানাবাড়িতে প্রচুর লোকজনের সমাগম। তবে বাজি-বাজনা বা স্ফূর্তি-আমোদের কোনো কিছুই ছিল না। বড় বড় দেগ হাঁড়িতে মাংস রান্না হচ্ছিল। সুগন্ধে বাতাস মাৎ হয়ে উঠেছিল।

কাজী বাড়ির মহিলারা সবাই আস্‌মাকে দেখতে লাগলেন। সৌজন্য প্রকাশও করলেন।

কিন্তু স্বস্তু ব্যবহারকারিনী ঐসব ভদ্র মহিলা [illegible] তাকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসাতে চাইলেন [illegible] না। এগারোজন মেয়েকে আলাদা করে বসানো হল যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল।

আশরাফ আর আতরাফ দুইভাগে বিভক্ত করে খানা খাওয়াতে বসিয়েছিলেন কাজী সাহেবের বাড়িতে আমন্ত্রিত এক বুড়ো মৌলবী।

ফৈজি সেখকে বসানো হয়েছিল আতরাফদের মধ্যে। যারা নিম্নশ্রেণীর মানুষ। পরে সে জানল, আশরাফ বা উচ্চ শ্রেনীর মুসলমান সৈয়দ-কাজী-মুফতি-আখন্দ-খোন্দকাররা নিম্নশ্রেণীর আতরাফদের ঘরে মেয়ে দেন না। সৈয়দদের পায়ে চুমো দিতে হয়। তাঁদের কাছে গিয়ে কথা বললে সরে দাঁড়ান।

ভারতের মুসলমান লোকেরা কথা বললে যেমন আরবের লোকেরা একটু সরে দাঁড়ান।

আহারাদির পর ইমাম নিয়াখত হোসেনের কাছে ফৈজি সেখ এ প্রসঙ্গটি তুললে তিনি বললেন, এসব করা অবৈধ। ইসলামের ওপরে অভিমান করো না—যে নির্বোধরা এসব করেন তাঁরাই ইসলামের উদার রীতির মুখে কালি লাগান—তাঁরাই আসল আতরাফ! এঁদের বংশকৌলীন্য নয়, আসল ব্যাপার ধনগর্ব।'

আস্‌মাও এটা লক্ষ্য করেছে। তবে সে খুশীও হয়েছে উত্তম স্বাদের পোলাও, জর্দা (মিষ্টি), মাংসের কোর্মা, কাবাব, মাছের কালিয়া, দই খেয়ে। নবাবী খানাপিনা। আর তাদের কাউকে পাত তুলতে হয়নি। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার নেই।

কয়েকদিন পরেই আবার ইমাম সাহেবের সঙ্গে রুকসানার বিয়ের নিমন্ত্রণেও খেতে গেল ফৈজি স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে। এসে শুনল 'রোশন চৌকির' বাজনা। ইমামের কথায় পংক্তিভেদ এবার আর লক্ষ্য করা গেল না খাওয়াবার সময়। মহিলাদের মধ্যেও না। এসব কাণ্ড হলে ইমাম সাহেব বিয়ে ভঙ্গ দিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন বলেছিলেন রুকসানার মাধ্যমে।

রুকসানা আস্‌মাকে জড়িয়ে ধরে এনে ঘরের মধ্যে বিছানার ওপরে বসিয়ে-ছিলেন।

আস্‌মাকে আদর করার কারণ হিসাবে রুকসানা বিয়ের কনে সেজেও ভোলে না, 'তোমার স্বামী ফৈজি সেখের জন্যে যেমন তুমি বাপের সংসারের চিরকালের দাসী হওয়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছ, আমিও এক মহা সংকট থেকে উদ্ধার পেয়েছি বোন। আমি নিজের হক থেকে তোমাদের আরো দু-বিঘে জমি দেবো।'

আস্‌মা রুকসানার চিবুক ধরে বলেছিল, 'তোমার মতন এমন রূপসী আর দয়াময়ী মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। আচ্ছা ভাই, ইমামের সঙ্গে আগে থেকে তোমার ভাব-ভালবাসা ছিল?'

জিভ কাটলেন রুকসানা। বললেন, 'ভাব-ভালবাসা বলতে যে শ্রেনীর কথা সাধারণ মানুষ ভাবে তা ইমাম সাহেবের মধ্যে আদৌ ছিল না। আমাদের বিয়ের কথা ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরও আমি হঠাৎ ওঁর ঘরে খাবার দিতে গেলেও—উনি শান্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। যেন একেবারে নিরুত্তাপ!'

'বয়স হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়তো!'

'সেটাই আমার সন্দেহ হয়।' আনমনা হয়ে যেন মনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন প্রচুর গহনা-গাঁটি পরা রুকসানা, 'এক শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়ানোর পর ওঁর মসজিদ থেকে ফিরতে দেরি হয়। দূরের কিছু সাগরেদ এসেছিল। তাদের কাছ থেকে যে সব সোনা এনেছিলেন তা ফেরত দেবার কথা জানাতে তারা নাকি খুবই মর্মাহত হয়। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে যাওয়াতে আমি ওঁর বিছানায় বসে বইপত্র দেখতে দেখতে ঘুমে ঢুলতে থাকি। তারপর এক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। উনি কখন এসে খেয়ে নেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে নাড়া দেন। আমি জেগে যাই। ওঁর হাতটা নিয়ে তার ওপরে মুখ চেপে ধরি। উনি শান্তস্বরে বলেন, 'যাও, খেয়ে নাও গিয়ে।'

তখন আমি বলি, 'না, যাব না।'

উনি রুষ্টস্বরে বলেন, 'ছেলেমানুষি করো না।'

আমি রাগলাম। লোকটির মধ্যে কি প্রেম-ভালবাসা, কামনা-বাসনা বলে কিছু নেই। ধর্মের অনুশাসনে সংযম শিক্ষায় পাথর হয়ে গেছেন? উঠে চলে যাবার সময় বলাম, 'আমি শুধু একটা কথা আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি কখনো কি আমাকে কামনা করেন নি?'

ঘাড় ফিরিয়ে ছিলাম তার হাসির শব্দে। পাথরও আবার হাসেন? যেন বন-কাঁপানো হাসি। বললেন, বাপের অন্নে আশ্রিত ব্যক্তি যদি গোপন মনে ভালবাসেও তার মূল্য রুপোর মতো না হয়ে কি হীরের মতো হবে?'

বললাম, 'এখন কি সেই রুপো হীরে হয়ে ওঠে নি?'

'অবস্থার ফেরে হয়তো তা'হয়েছে কিন্তু আমার বয়স হয়েছে, যা চাও তুমি তাতে আমি অভ্যস্থ নই। সীমা ছাড়াতে আমি ভয় পাই।'

'আমি নেমে আসছিলাম। সিঁড়ির পাঁচ ধাপে যখন উনি উঠে বললেন, 'তুমি দ্বিধান্বিতা হয়ো না। তোমার দোষ নেই। তুমি আমার জন্যে কষ্ট পেয়েছ বুঝতে পারি কিন্তু যাঁর ওপরে অভিমান ছিল তিনি যখন গত হয়ে গেলেন, কার ওপর আমি আর রাগ করব? এখন আমার ভয়, যে বয়সে যা হওয়া উচিত ছিল, তা আমি অতীতে ফেলে আসিনি তো?'

'আমি উঠে এলাম। তাঁকে কদমবুসি করার পর হঠাৎ বুকের মধ্যে ধরা দিলাম। ওঁকে জড়িয়ে ধরে রইলাম। উনি মাথায় মুখ রেখে কাঁদতে লাগলেন। থরথর করে কাঁপছেন তখন তিনি। বুঝতে পারলাম তাঁর আবদ্ধ উত্তাপ

কতখানি। ছেড়ে দিয়ে বুকের মাঝখানে চুমো দিয়ে বললাম, 'আমি চিরকাল আপনারই। যেখানে যেমন ভাবে রাখতে চান আমাকে আমি তার বিরুদ্ধতা করব না।'

রুকসানা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মৃদু একটু হেসে বললেন, 'শুতে না গিয়ে, আমি জানলা দিয়ে এরপরে লক্ষ্য করি উনি গোসল করতে গিয়েছিলেন পুকুরে। আমিও গিয়েছিলাম গোসলখানায়।'

আস্মা হাসল কথা শুনে।

আহারাদি পর্বের পর সাদির সমস্ত কর্ম শেষ হয়ে যেতে দুলহিনকে (কনেকে) দুলহার (বরের) ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফৈজি সেখ স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে বাড়ি চলে এলো।

কয়েকদিন পরে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত ছিল ফৈজি—হঠাৎ রমজান নামের কাজী বাড়ির কাজের লোকটি এসে বলল, 'তোমারে একবার কাজী বাড়িতে যেতে হবে গো মিয়া—ইমাম সাহেব ডেকে পাঠালেন।'

ইমাম সাহেবের কাছে আসতে তিনি বললেন, 'ফৈজি মিয়া, দেখো, এই মসজিদে আজান আর নামাজ যাতে বজায় থাকে। আমি রুকসানাকে নিয়ে এখান থেকে লখনৌ চলে যাব স্থির করেছি। বাড়িতে আমার মা-বাপ এখন বৃদ্ধ আর অসুস্থও বটে—চিঠি পেয়েছি। তাছাড়া তুমি বোধ হয় জান না, কাজীবাড়ির জমি আমাদের সাদির পরদিনই বখরা হয়ে গেছে। আমার শ্বশুর সাহেবের আগের তিন বিবির সমস্ত ছেলেরাই তাঁদের শ্বশুর বাড়ি চলে গেছেন। তাঁদের সম্পত্তি দানপত্রের নামে বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। এমন কি বাড়ির অংশ পর্যন্ত মণ্ডল জমিদারের নায়েব শংকর ঘোষকে দিয়ে গেছেন। ছোট বিবির ছেলে শাহ আলমের ওপর তাঁদের রাগ। সোনা-গহনা টাকার বখরা কেন ইমামের ইচ্ছায় জমির ফারাজের মতো ছেলেদের দশ আনা, মেয়েদের চার আনা, মায়েদের দু-আনা হিসাব দেওয়া হল না? এসবও তো সম্পত্তির অন্তর্গত। আসলে নাকি শাহ আলম আর আমার ইসলামী শিক্ষা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই। তর্ক ঝগড়া বাঁধলও। শেষে বড় ভাই বললেন, তোর বোন রুকসনার ঘর হল না কেন? ইমামের সঙ্গে তার ঢলাঢলি হয় নি? মসজিদ সংলগ্ন বাড়িতে পাপাচার হওয়ার অভিশম্পাতে কাজী বংশ ছিতিছান হয়ে যাবে।'

ছোটবিবি তখন বলেন, এদের মুখ দেখাও পাপ। এরা যা চায় শাহ আলম, তাই করো। দ্বিতীয় আর কোনো কথা নয়।'

গম্ভীর ভাবে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ ইমাম সাহেব।

রুকসানা এসে ফৈজির হাতে একটা দলিল দিলেন। বললেন, 'এটা তুমি রাখো ভাই। আমার অনেক উপকার করেছ। তোমাকে দু-বিঘে বাগান আর তিন বিঘে ধানী জমির অধিকার দিয়ে পাকা দানপত্র লিখে দিলাম।' ফৈজি বলল, 'এসব কি হয়ে গেল রুকসানা বোন, আমার কাজীবাড়ি আর এই মসজিদ 'বিরান' (ধ্বংস) হয়ে যাবে।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'শাহ আলমও লখনৌ চলে যাবে আমার সঙ্গে। ওঁর শ্বশুরবাড়ির কিছু নেই। মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের দরিদ্র এক শিক্ষকের কন্যাকে বিনা টাকা-পয়সায় বিয়ে করেছিল। কিন্তু লখনৌয়ে নানার (দাদা-মশায়ের) অনেক বিষয়-আশয় পাবে।'

'কাজী বাড়ীতে কেউ থাকবেন না?' শুধোলে ফৈজি মিয়া। 'তাহলে মসজিদে নামাজ পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে?'

'ঐ তো, বড় ভাই চক্রান্ত করলেন। পাশেই পুব-দিকের দেওয়ান আমিলউদ্দিন, দক্ষিণ পারের হাসিম মুফ্‌তি, উত্তর পারের নওয়াজ মুন্সিদের, যাঁদের হোক কাজী বাড়িটি আর তাদের ভিটেটা বিক্রি করা যেত কিন্তু দেওয়া হল জমিদারের নায়েবকে যিনি নাকি সাহেবদের সামনে কিছু নজরানার যোগান দেন—আগে যাঁর কাছে ছিলেন, অন্য এক জমিদারকে 'রায় বাহাদুর বানিয়ে ইংরেজের গোলাম বানিয়েছেন। শংকর ঘোষ ঘোড়ায় চড়ে পাইক পেয়াদা নিয়ে এসে বলে গেছেন বাড়ির তিনভাগ খালি করে দিতে। আর চতুর্থ ভাগের জন্য তিনি ভালই অর্থ দিতে চান।'

'শাহ আলম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল'—ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, 'আমি বাধা দিয়ে বললাম, মারামারি খুনোখুনির মধ্যে তুমি পড়ে যাবার জন্যেই তো তোমার সৎভাইরা এই জটিল বিষয়ী লোকটার কাছে বাড়ি বিক্রি করে গেছেন। তুমি আর বাপ-দাদার ভিটের টান টেনো না। ঠাণ্ডা মাথায় বাড়ি বিক্রি করে দাও। চলো, আমরা লখনৌয় চলে যাই। পনেরো হাজার টাকা শাহ আলম বাড়ির অংশ বিক্রি করে দিয়েছে। মসজিদ আর কবরস্থান দখল করবেন না শংকর ঘোষ কথা দিয়েছেন। সেই হিসাবে দলিলও করে নিয়েছেন। লখনৌ চলে যাবার দিনক্ষণও ঠিকঠাক আগামী পরশু সোমবার। ফৈজি মিয়া পারলে তুমি মসজিদে আজান আর নামাজের ব্যবস্থা রেখো।'

ফৈজি বলল, 'নিশ্চয়ই রাখব, আল্লা যেন সে ক্ষমতা অমোদেরকে দেন, তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমি আজানের ব্যবস্থা নেবো কিন্তু কেউ বোধহয় আর নামাজ পড়তে আসবে না। যিনি এই জায়গার মালিক হবেন তিনি ভিন্ন ধর্মীয় মানুষ—চাপ সৃষ্টি করলে আমি একা কেমন করে টিকে থাকব? তাছাড়া আমি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্মের সেবক হয়ে থাকলে বিদ্বেষ বাড়তেও পারে। নায়েবের বিরুদ্ধে জমিদারের সাহায্য পাব এমন আশাও নেই।'

ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তবু সত্যের ওপর টিকে থেকো। আমার একক শক্তিতে ইসলামের খেদমতে আমি অনেক করেছি একথা বলে অহংকার করতে চাই না। তবু একশো আঠারোজনকে আমি মুসলমান করে আল্লার পথে এনেছি—তোমরা নামাজ-রোজা ছেড়ো না। যাকাতের ব্যবস্থা বহাল রেখো। পারলে হজে যেও তুমি।'

ফৈজি সেখ বিদায় চাইলে পরশু সকালে আসতে বললেন ইমাম সাহেব। আর বললেন যে সব জমি বাগান তাকে দেওয়া হয়েছে তাদের ভাগচাষীদের ডেকে বলেও দেওয়া হয়েছে—যখনি ফৈজি সেখ অধিকার চাইবে তখনি তারা ছেড়ে দেবে। কালকেই যেন অধিকার দাবি করে দলিল দেখিয়ে। যদি তিনজন ভাগচাষী কেউ আপত্তি করে তবে যেন সঙ্গে সঙ্গে জানায়। শাহ আলম গিয়ে তার সঙ্গে মোকাবেলা করে আসবে। নইলে পরশু থেকে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

পরদিন সকালে জমি চাষী দুজন হিন্দু দলিল দেখে বলল, 'মালিক যখন জমি বিক্রি দলিল করে দিয়েছে আমরা আর না-করব কি উপায়ে—আমাদের তো আর বাপকেলে জমি নয়। তুমিই এখন মালিক।'

কিন্তু গোলাম জমাদার তেরিয়া হেঁকে বলল, 'ওসব কথা 'ফল্‌সো'। ও দলিল আমি পড়তে পারি না। বাগান চাষ করতে-দেখতে দিয়ে গেছে কাজী সাহেব। দশ বছর তাকে সব কিছু আধাআধি দিয়ে এসেছি—নারকোল, সুপুরি, 'ক্যালা', 'অাঁজির' (পেয়ারা), লেবু, বাঁশ, পুকুরের মাছ—সবই।'

ফৈজি সেখ বলল, 'তোমাকে কাজী সাহেবের ছোট বিবির ছেলে শাহ আলম সাহেব বলে দেন নি কাজী বাগান বিক্রি দলিল করে দেওয়া হয়েছে বলে?'

'বলেছে তো, কিন্তুক কার জমি? কাজী সাহেব তো মরার আগে আমাকে বলে যায় নি?'

লোকজন যাঁরা জুটেছিল তারা হেসে উঠল।

ফৈজি বলল, 'কাজী সাহেব মৃত্যুর যন্ত্রনায় যখন অস্থির তখন জমি-জায়গার কথা কি মনে ছিল? তাঁর মরার পর সব জমি তাঁর ছেলেদের মধ্যে বখরা হয়ে গেছে। এই বাগান পড়েছে শাহ আলমের ভাগে। বাপের জমি ছেলে পাবেন না? তাঁদের বাড়ি সমেত সব কিছুই তো বিক্রি হয়েছে—তাঁরা সব কিছু বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছেন—অন্য জায়গায়।'

গোলাম জমাদার নামেই মুসলমান। তাড়ি খায়। দাড়ি চাঁছে। কাছা দিয়ে খাটো ধুতি পরে। ভাল লাঠি খেলে গামারার সময় তেজিয়া গড়ে, তাই সে কাউকে তোয়াক্কা করে না। সাত বেটা তার লাঠি ধরলে নাকি রাজ্য জিতে নিতে পারে। তার ভয়ে বাগানে কেউ বাঁশপাতা পর্যন্ত ঝেঁটোতে যেতে পারে না।

মাথা চুলকে চুলকে গোলাম বলল, 'বললিই তো বাগানের জমি ধানীজমির মতন হাত-বদল করা যায় না তাহলে সমস্ত মাছ ধরে লোব মুই, গাছের নারকোল ক্যালা, ফল-ফসল মুলিয়ে পেড়ে লোব—তারপর দখল দোব।'

ফৈজি বলল, 'না, অর্ধেক পাবে, ভাগচাষী তো তুমি।'

গোলামের সাতছেলে এসে বলল, 'আমরা অদ্দেক দুবু নি। সব পেড়ে লোব।'

এমন সময় সবাই দেখল শাহ আলম আর ইমাম নিয়ামত হোসেন আসছেন ঘোড়ায় চড়ে।

তাঁরা এসে গেলে গোলাম ছুটে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম জানাল। যেন কোনো কিছুই হয়নি।

সালাম জানিয়ে ফৈজি সেখ বলল, এ বাগানের অধিকার গোলাম জমাদার কাজী সাহেবের কাছ থেকে ভাগচাষের জন্য দশ বছর পেয়ে আসছে, তিনি ছাড়ার কথা মরার আগে কেন বলে যান নি এসব বলছিল। এখন বাগান ছাড়লেও সব ফল-ফসল মুলিয়ে পেড়ে নেবে। মাছও ধরে নেবে! আমি বলেছি অর্ধেক মালিকানী বখরা দিতে হবে। ওর ছেলেরা নারাজ। লাঠি ধরে পাকসাট দেখাচ্ছিল; আপনাদের দেখে লাঠি লুকিয়ে ফেলে 'এখন সাধু সাজছে।'

শাহ আলম বললেন, 'কোন ছেলেগুলো? বাপ কেলে জমি?'

গোলাম বলল, 'কই না, কিছু বলিনি তো মোরা!'

শাহ আলম বললেন, 'ঐ বাগানে তুমি, গোলাম জমাদার আর তোমার ছেলেরা কেউ উঠবে না। ফৈজি সেখ ফল-ফসল-মাছের অর্ধেক বখরা দিয়ে

দেবে। ঝুনো নারকেলের, পুরুষ্টি কলা বা ফলের, তিন বছরের বাঁশের আর সমস্ত মাছের বখরা হবে। ডাব, কচি কলা বা ফল পাড়বে না। তুমি যখন দখল পাও এই ভাবেই পেয়েছিলে। এসব কাজের মীমাংসা করার জন্যে মুসলমান পাড়ার সাতজন মুরুব্বি ঠিক করে দেবে।'

সাতজনকে বাছাই করে দিলেন শাহ আলম। তাঁরা ফিরে আসার সময় ইমাম সাহেব বললেন, আজই তোমরা ফয়সালা করে ফেল ভাই, নতুবা দায়িত্ব আরো বাড়বে। ফৈজি মিয়াও বাগানে আজ উঠো না—জমাদারও উঠবে না। ঐ সাতজনের জিম্মায় থাকল বাগান। কাজ করানোর দাম উভয়েই সমান ভাগে দেবে। একাজ হবার পর ফৈজি সেখ পূর্ণ মালিকানা পাবে। সে যদি বাগান ভাগচাষে না দেয় তো কেউ পাবে না।'

ওরা চলে গেলেন।

সাত মুরুব্বি যুক্তি করে নারকেল ফল ইত্যাদি পাড়াল, বাঁশ কাটাল, মাছ ধরাল।

দুপুর পর্যন্ত ফৈজি সেখ বসে রইল বাগানের বাইরে। তার দিকেই এখন বেশি লোকজনের সমর্থন।

বিকেল হয়ে গেল সমস্ত বখরা হতে। জমাদার সব জিনিস নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। মাছ বেচে দিলে।

ফৈজি সেখও বাড়িতে আনল বাগানের ফল্ ফসল। মাছ অনেককে বিলিয়ে দিল। শুধু দুটো বড় কাৎলা রাখল। একটা পাঠাল কাজী বাড়িতে।

সকালে পাইকের এল নারকেল, কলা, বাঁশ ইত্যাদি নেবার জন্য। তাদের সেসব দেবার পর তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে কাজীবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়ে দেখল শংকর ঘোষ বাইরে চেয়ারে বসে আছেন। পাইক পেয়াদারা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের জিনিসপত্র বার হচ্ছে। কাঠের আসবাবপত্র কিছু নয়। কেবল পোষাক-আশাক বিছানা আর বইপত্র। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বোঝাই হচ্ছে।

শাহ আলম কাছে ডাকলেন ফৈজি সেখকে। তার দু-গাল বেয়ে তখন জল নামছিল। কাঁদছিল একপাশে দাঁড়িয়ে। সে কাছে যেতে দু-খানা লেপ, দুটো গদী, দুখানা কম্বল, একটা গালিচা আর কিছু কাপড় চোপড় দিয়ে বললেন, 'এগুলো তুমি নিয়ে যাও। আমরা আর কত নিয়ে যাব? আর ঐ সাদা ঘোড়াও তুমি নিয়ে যাও।'

পুঁটলি করে সব কিছু বেঁধে নিয়ে ফৈজি সেখ মসজিদের বারান্দায় এনে রাখল।

যাবার সময় হয়ে গেল।

তুপুরের নামাজের সময় হয়েছে দেখে ফৈজি সেখ আজান দিল মসজিদ থেকে।

রুকসানা আর তাঁর মা ছোটি বেগম, শাহ আলমের স্ত্রী আর বাচ্চাটি মালপত্রের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইমাম নিয়ামত হোসেন, শাহ আলম নামাজ পড়লেন—আরো কয়েকজন এলেন।

তারপর বিদায়ের পালা।

ইমামকে জড়িয়ে ধরে ফৈজি সেখ কাঁদতে লাগল, 'আমি কার ভরসায় থাকব? আপনি ছিলেন আমার গুরু, মন্ত্রণাদাতা, বাপের চেয়েও অধিক!

পিঠে চাপড়ে সান্ত্বনা দিলেন নিয়ামত হোসেন। ক্রমেই লোক জমে যেতে লাগল। দেওয়ান, মুফতি, মুন্সি পরিবারের লোকরা ইমামের জন্য অশ্রুপাত করতে লাগলেন। শংকর ঘোষ তখন কাজীবাড়ি অন্দর মহলে ঢুকে সব কিছু দেখাশুনো করছিলেন।

ঘোড়ার গাড়ি চলতে লাগল।

রুকসানার বড় বড় চোখ তুটো চোখে পড়ল ফৈজির। গাড়িথেকে মাথা বার করে ফৈজির দিকে তাকিয়েছিলেন। অশ্রুভরা হাসিমাখা চোখ।

ইমাম সাহেব গলা বার করে হেঁকে বললেন, 'আসছি ভাই, ভয় নেই, আল্লা আছেন।'

গাড়ি চলে যাবার পরও ফৈজিসেখ মসজিদের বারান্দায় অনেকক্ষণ বসে রইল। লোকজন চলে গেল। সেও চলে যাবে শূন্য মসজিদ ফেলে রেখে?

রমজান সেখ যেন পাগল হয়ে গেছে। সে একবার কাজীবাড়ির সামনে যাচ্ছিল আর ইমামের বাড়ির সামনে—বারবার ফিরছিল—আর বিড়বিড় করছিল। তাকে গিয়ে ধরল ফৈজি সেখ। বলল, 'কাকে খুঁজছ তুমি?'

বোকার মতো বলল রমজান, 'রাত্তিরে কে থাকবে তাহলে? কে আলো জ্বালবে? মাজারে মোম জ্বালাবে, আগরবাতি দেবে? চাবির গোছা নিয়ে নিল ও লোকটা কে? কাজী সাহেবকে কি কৈফিয়ত দোব?'

'কিচ্ছু কৈফিয়ত কেউ আর তোমার কাছে চাইবে না। তুমি শুধু মসজিদের

পাশের ঐ গুমটিতে থাকবে। রান্না করে খাবে। মসজিদ সাফ করবে। আজান দেবে ঠিক সময়ে সময়ে। আমি তোমাকে মাসে কুড়িটাকা মাইনে দোব। কাজীবাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে—ওখানে আর যেও না। মসজিদে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ থাকব। কাজী সাহেবের হুকুম?'

'হ্যাঁ।' বলল ফৈজি। তাকে দেওয়া কাপড়-চোপড় থেকে কিছু কাপড় আর কম্বল লেপ দিল বিছানার জন্য।

তারপর চলে এলো ফৈজি। ঘোড়ার পিঠে মালপত্রগুলো চাপিয়ে দিয়ে আনল।

গালিচায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল আস্‌মা। বলল, 'এত সুন্দর গালিচা ছেড়ে রেখে গেল!'

ফৈজি বলল, 'কত সুন্দর বাড়ি-মসজিদ-মাজার ছেড়ে রেখে যেতে পারলেন আর গালিচা, কি যে বলো তুমি!'

'সারাদিন চান-খাওয়াও হয়নি তোমার?'

'কখন আর খাওয়া হল? মনেও তো ছিল না।'

সব কিছু বিষণ্ণতার মধ্যেও ফৈজি সেখের মনের মধ্যে যেন একটা আনন্দের গোলাপ-কুঁড়ি পাঁপড়ি মেলে ফুটে উঠেছিল—তার সুগন্ধ পাচ্ছিল—তবু ঘুম জড়ানো তার চোখে—রাত শেষ হয়ে এলেও ভাল করে ফরসা হয়নি তখনো। তবে এটা অনিবার্য যে ফুল ফুটবেই।

বিষয়টা হল সে আর গরিব নেই। সাড়ে এগারো বিঘে জায়গার মালিক।

এবার পাকাবাড়ি তুলবে সে কাজী বাগানের মধ্যে বড় পুকুরটার পাশে।

এরপর একদিন সে খবর পেলে তাঁর বাপ বামাচরণ সরদার মারা গেছে।

বিধবা মা এলে ফৈজি সেখ তাকে চাল আনাজ কাপড় দিয়ে সাহায্য করল।

প্রায়ই তার মা এসে আসমার কাছে বসে গল্প করে।

[১১]

বাম গুরু মশায়ের পাঠশালায় ফতেহার যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন আশ্চর্য রকম কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল।

কাজীবাড়ির মসজিদে দু-বছর ইমামের কাজ করেছিল ফৈজিসেখ, তারপর

রমজান সেখ মারা যেতে নোয়াখালীর দিক থেকে এক কালো গাট্টা চেহারার আরবী জানা বাঙাল লোক 'মৌলুদ' (ধর্মসভা) করতে এসে রয়ে গেলেন। তাঁকে ইমাম আর মৌলবী বানালে ফৈজিসেখ কাজীবাড়ির মসজিদে। চারপাশের গাঁয়ের মুসলমান ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসার পড়া পড়তেও যেতে লাগল তার কাছে।

রোজার পর ঈদুল ফেতরের দিন কাজীবাড়ির মসজিদে আড়াই শো জন পুরুষ নামাজ পড়ল। কিন্তু তিনমাস পরে বকরঈদের নামাজ পড়ার পর গরু কোরবানীতে বাধা দিলেন শংকর ঘোষ। হঠাৎ দারোগা-পুলিশ তুলে আনলেন।

মুসলমানরা বলল, 'চিরকাল, সেই মোগল আমল থেকে এই মসজিদের ঈদগাহে কমকরে দশ-বিশটা গরু কোরবানী হতো এখন হবে না কেন ?'

নতুন হিন্দু বড় দারোগা শংকর ঘোষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা মদত পেয়েছেন, তাই বললেন, 'না, হবে না। হিন্দু পরিবার আছে মসজিদ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।'

ফৈজি সেখ বলল, 'তিনি জেনে শুনে তবে এখানে বাস কবতে এলেন কেন ?'

মুসলমানরা সবাই বলল, 'আমাদের সবাইয়ের প্রাণ গেলেও আমরা কোরবানী দেবোই। নইলে এই মসজিদের কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়া হবে।'

দারোগা ভয় দেখালেন, 'যে ইমাম গরুর গলায় ছোরা চালাবে তাকেই আগে গুলী করা হবে।'

ইমাম গফুর হায়দার বুকে চাপড় মেরে বললেন, 'ইংরেজ বাহাদুরের আইনে মুসলমানদের ওপর জুলুম করতে যদি সেই দয়াময় সরকার আপনাকে পাঠিয়ে থাকেন তবে তাই করুন আমি আপনার হাতে শহীদ হয়ে যাব।'

মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন ধ্বনি দিল, 'নারায়ে তক্‌বীর !'

সবাই জোরসে চিৎকার ছাড়ল, 'আল্লাহু আকবর !'

বড়দারোগা শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন পর্দা টাঙিয়ে আড়াল করে গরু কোরবানী দিতে হবে। আর কাজী ডাঙার ভেতর দিয়ে কাটা গরুর লাস রক্ত ঝরিয়ে ফেলে ফেলে যাওয়া চলবে না। রাস্তা দিয়ে চাপা দিয়ে বার করে নিয়ে যাও।'

প্রথমে মুসলমানরা শুনতে চায়নি, পরে ফৈজি সেখের কথায় টিকে থাকার নীতিতে সবাই খুনোখুনিতে না গিয়ে বড় দারোগার কথাই মেনে নিলে।

পর্দা ঘিরে দিয়ে গরু কোরবানী হল।

শংকর ঘোষ এরপর থেকে মসজিদের চারপাশ দিয়ে বেড়া দিয়ে দিলেন। মসজিদের বড় পুকুরে যাওয়ার পথ বন্ধ হল। গড়পার হয়ে কেবল মসজিদে নামাজ পড়তে যাবার পথ সরু করে খোলা রাখা হল পশ্চিমদিকের প্রধান পথের দিকে।

হঠাৎ ইমাম গফুর সাহেব এক রাত্রে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। মুন্সীদের বড় মতো কোরআন পাঠরতা মেয়েটিকেও নিয়ে তিনি পলাতক হয়েছেন।

মাদ্রাসা উঠে গেল। ওক্তিয়া নামাজ বন্ধ হয়ে গেল মসজিদে। কয়েক সপ্তা কেবল জুমার নামাজ পড়া হবার পর ফৈজি মিয়ার অসুখ করাতে তাও গেল বন্ধ হয়ে।

শংকর ঘোষের বাড়িতে তখন বেশ রমারমা। ঘরে ঘরে ঝাড়বাতি জ্বলে। বাঈ নাচ হয়। কালীপুজো, দুর্গাপুজো শুরু হল। হিন্দু বসবাস হয়ে গেল কাছাকাছি কয়েক ঘর। বিখ্যাত কবিয়াল এসে কবি গান করল ঘোষের বাগানে। তরজা পুতুল নাচ হল।

শংকর ঘোষ চারদিকের জমি-জায়গা প্রায় সাতশো বিঘে দখল করে বসলেন। শংকর ঘোষ মণ্ডল বাবুদের জমিদারী কিনতে পারেন নি বটে কিন্তু ইংরেজদের সোনা আর হীরা নজরানা দিয়ে স্বয়ং লাটের কাছ থেকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি আর নিস্কর একশো একর জমি পেয়েছিলেন।

আরো চল্লিশ বছর পরে ফৈজি সেখ বুড়ো বেলায় তার কাজী বাগানের পাকা দর-দালানে বসে ফতেহারের ছেলে শের আলীকে গল্প শোনাবার সময় বলে, 'কাজী বাড়ির 'বোধ' পুকুরে ঐ যে জেঁাকা (যখ) ছিল—চুল মেলে যাকে অনেক লোক ভাসতেও দেখেছে নাকি—সেই জেঁকোর উদ্ধারের জন্য আমার শ্বশুর সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় মারা যাবার পর শংকর ঘোষ তাঁর অন্য স্ত্রীর ছেলেদের অনেক জমিজমা নামমাত্র দামে জবরদখল করে নেবার পর আমার ছোটশালা গয়াতে গিয়ে জেঁাকার নামে পিণ্ডদান করে এলো।'

'যাহোক পিণ্ডদানের পর যেদিন আমার ছোটশালা বাড়িতে ফিরল সেদিন রাত্রে হঠাৎ ভূমিকম্প হতে লাগল। মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। 'বাঙালী' (হিন্দু) পাড়ায় শাঁখ বাজতে লাগল। আমি আল্লা আল্লা করছি, আমার বহু কষ্টের পাকা বাড়ির ছাদ বা দেয়াল না ফেটে যায়। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে দক্ষিণ দিকে কোনো বিশাল বাড়ি পড়ে যাবার শব্দে মাটি যেন কেঁপে উঠল। সকালে জানা গেল শংকর ঘোষের সেই অভিশপ্ত কাজী বাড়ি খিলেন ভেঙে চাপা পড়ে গেছে। আর ৩০/৪০ জন মানুষের কেউ প্রাণে বেঁচে নেই। ডাবের কাঁদি

পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়েছে। জোঁকা পিণ্ডদানের পর ঐ রাত্রে ভূমিকম্প জাগিয়ে আছাড় কাছাড় করে মারা যায়। সেই গোটা বাড়িটাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে দিয়েছে।

শের আলী তখন এন্ট্রান্স পাশ করেছে সবে। সে বলল, 'জোঁকা যে টাকা মোহর দিত এটা কি সত্য?'

ফৈজি সেখ বলল, 'আদৌ সত্যি নয় ভাই—এসব অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনী। আগের যুগে মানুষ অসৎ উপায়ে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হলে অপদেবতার আশীর্বাদে তা লাভ করেছে বলে রটাত।'

শের আলী বলল, 'নোদাখালীর কাজী জোলো খাঁর বাড়ি ঘোষবাড়ি হবার পর ধ্বংস হল কি ওখানের মসজিদ বিরান করার জন্য আল্লার 'গজবে' (ক্রোধের দ্বারা যে অভিশম্পাৎ)?'

ফৈজি বলল, 'সেটা আল্লাই জানেন! তবে মনে হয় ভূমিকম্পেই—খিলেনের ওপর ছিল ঐ ঘর বাদশা আকবরের পর বা সেলিমের সময় থেকে। অনেক মনসবদার, সুবাদার, কাজী ঐ বাড়িতে গুজরান করে গেছেন।'

ফতেহার আলী চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠশালার পাঠ নেবার পর মাদ্রাসায় গিয়ে মৌলবী হলেও ভাল 'বয়ান' (বর্ণনা) করতে পারতেননা মিলাদমহ-ফিলে। তাই গ্রামেই মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে সেখানে ইমামতি আর মৌলবীর কাজ চালাচ্ছিলেন।

ফৈজি সেখ বেশি সময় মসজিদেই পড়ে থাকেন। পঞ্চাশ বিঘে জমির মালিক হয় সে প্রতি বছর দু-এক বিঘে করে জমি কেনার পর।

বাবা মৌলবী হলেও ফতেহারের ছেলে শের আলী ইংরেজি স্কুলে পড়েছে। দূরের স্কুলে আরবী ছিল না বলে সংস্কৃত পড়তে হয়েছে তাকে। সংস্কৃত পড়ার ব্যাপারে বাবা ফতেহার মোল্লার আপত্তি থাকলেও ঠাকুরদাদা ফৈজি সেখের তা ছিল না।

শের আলী নামাজ পড়ে না, রোজা করে না বলে বাবা গজগজ করেন দাদুকে শুনিয়ে, 'হবে না, দেব ভাষা 'প্যাটে' গ্যাছে তো! হিন্দু বন্ধুও জুটেছে মেলা। ওদের আর পাপপুণ্য কি—'রোজ কিয়ামতের (পৃথিবী ধ্বংসের পর) 'হাসরের' (শেষ বিচারের) ময়দানে এক আল্লার ভজনা না করা বহু মনগড়া দেবদেবীর উপাসকরা প্রেতাত্মা হয়ে উঠবে। অনন্তকাল দোজখ ভোগ করবে। শের আলী প্রাইমারী স্কুল থেকে সরস্বতী পুজোর পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া প্রসাদী

এনেছিল কলা পাতায় মুড়ে—আমি বললাম, ফেলে দে। সে ফেলে দিল মাটিতে। বললাম, যেখানে ফেলেছিস সেখানের সত্তর. হাত মাটি কাঁদবে। তারপর সে পানিতে ফেলে দেয়। এখন সে কি বলে জানো?'

ফৈজি সেখ নাতির যুক্তিতর্ককে পসন্দ করে—তাতে মজাও পায়—তাই শুধোয়, কি বলে শেরআলী?'

'বলে, মাটি কাঁদবে, পানি কাঁদবে না কেন?'

'বটেই তো।' বলল ফৈজি মিয়া। তার কথা শুনে হাসল শের আলীর মা গোলেনূর বানু।

ফতেহার গ্রামের মোল্লাও—তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'বটেই তো মানে? তোমার আস্কারাতেই তো ও মাথায় উঠেছে। তোমার পুঁথি পড়া ও শুনেছে। উজের কাহিনীতে আছে সে এত লম্বা ছিল যে কখনো কোনো পুকুর-ডোবায় মাথা ডুবিয়ে 'গোসল' করতে (গা ধুতে) পারত না। মুহনবী 'আলাহে সাল্লামে'র (তাঁর ওপরে খোদা তায়ালার করুণা বর্ষিত হোক) কথা না শোনার জন্যে যখন অভিশপ্ত মানুষদের ওপর নেমে এলো ভয়াবহ বন্যা—নবীজীর নৌকোয় বিশ্বাসীরা উঠে প্রাণ বাঁচালেন। বাকিরা 'ফৌত' (ধ্বংস) হয়ে গেল। তখন উজ্ নীল দরিয়ার একবুক পানিতে মাথা ডুবিয়ে 'গোসল' ক'রে আরাম পায়। উজ্ হাত লম্বা করে সূর্যের তাপে ধরে মাছ-মাংস পুড়িয়ে কাবাব করে খেত। শের আলী এখন বলে, এ গল্প ছেলেদের মজা লাগাতে পারে কিন্তু একটু বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করলে প্রশ্ন উঠবে, উজ্-বেটার মাছ-মাংস 'কাবাব' (পোড়ানো) হতো, হাতটা পুড়তো না কেন?'

চৌকিতে বসে ঢ্যারা ঘুরিয়ে পাট কাটতে কাটতে ফৈজি মিয়া বলে ওঠে, 'বটেই তো—বটেই তো!'

ফতেহার মোল্লা দাড়িতে মেহেদি পাতার রঙ লাগিয়ে লাল করেন চুলগুলো অকালে পেকে যাওয়ার জন্য। চোখে সুর্মা টেনে পাজামা-পীরহান পরে লাল দাড়ি আঁচড়ে ন্যাড়া মাথায় 'কিস্তি'র (নৌকোর) টুপি লাগিয়ে বেরুবার সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কোন গ্রামে যাবেন 'খতম' (পবিত্র কোরআন সমাপ্তি পাঠ) করতে। লোক এসেছে নিয়ে যেতে।

ফৈজি মিয়া নাতনি জোহরা খাতুন আর বৌমাকে শুনিয়ে বলে, 'আগের যুগের লেখায় ঐ রকম বাড়াবাড়ি ছিল। কত লম্বা বোঝাতে উজের সূর্যের তাপে মাছ-মাংস কাবাব করার কথা বলা হয়েছে। যেমন রামায়ণে আছে, রাবণের

ভাই কুম্ভকর্ণ, রামায়ণে আছে হনুমানের কথা। কুম্ভকর্ণ ছ-মাস পড়ে ঘুমোত, জাগলে শত শত মণ খাবার খেয়ে নিত আর হনুমান বিশল্যকরণী ওষধি গুল্ম চিনতে না পেরে পর্বত উপড়ে মাথায় করে নিয়ে চলে এলো।

বাবাজী চলে যাবার পর শের আলী ব্যস্ত হয়ে এসে বলে, 'দাদু, মিঃ ফাল্‌মন হোম এসেছেন—কামরা গ্রামের নীলকুঠির সাহেব!'

'সাহেব!' ফৈজি মিয়া যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'হুঁ' বলল শের আলী। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।'

কাজী জেলায় খাঁর কথায় সাহেবদের ওপরে চটা ছিল ফৈজি সেখ কিন্তু এটা ও তার মনে হল নবাব-বাদশাদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই ছিল আমাদের কি? আমরা তো লোটা-ঘটির মত গড়াচ্ছি। আমি নাহয় কাজী বাড়ির দয়ায় পায়ের তলায় মাটি পেয়েছি কিন্তু আর সব মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘোঁচাতে পারলে কৈ? একথা বললে, নিরাকার আল্লার করুণার বা ভাগ্যের কথা বলেন মৌলবীরা।

সাহেবকে বসাতে বলল ফৈজি মিয়া 'দহ্‌লিজ' (বৈঠকখানা) ঘরের চেয়ার-টেবিলে।

শের আলী মাকে লেবু দিয়ে সরবৎ করতে বলে হাত পাখা নিয়ে যাবার সময় বললে, 'এসো দাদু, আলাপ করবে, সাহেব ভাল বাংলা জানেন—খুব আমুদে লোক। নীলকুঠির আপিসে আমাকে চাকরি দেবেন বলেছেন।'

মিঃ ফাল্‌মন হোম ফৈজি মিয়াকে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়ালেন। হাত ধরে ঝাঁকালেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'আপনার কথা হামি শুনিয়াছি। আপনাকে হামার সালাম—বহুৎ বহুৎ 'সুক্রিয়া' (ধন্যবাদ)।'

ফৈজি মিয়া বলল, 'আপনি তো সাধুভাষায় বেশ ভাল বাংলা বলতে পারেন!'

'হুঁ, আপনাদের বাংলা ভাষা হামি শিখিয়াছি—আপনার নাতি হামাদের ইংলিশ ভায়া শিখিয়াছে। ভাষা শিক্ষায় ডোষ নাই। হামি হিণ্ডি ভাষা আউর থোরা থোরা ফারসী-আরবীও জানি।'

সাহেব সরবৎ খেলেন। বললেন, 'হামি কোকোনাট খাইব। মুরি খাইব। মুরগি-মাছ-ভাজা দিয়া ভাট্ খাইব।'

'বহুৎ আচ্ছা—নিশ্চয়ই খাবেন।' বলল ফৈজি সেখ। সাহেবকে দেখতে পাড়ার লোক ছুটে এলো। মেয়েরা গোরা সাহেবের রঙ, নাক, চোখ, লাল্‌চে চুল দেখতে লাগল।

সাহেবের চোখের তারা নীল। জোহরা খাতুনকে দেখে তিনি কাছে ডাকলেন। শের আলীর কথায় সে এলো ভয়ে ভয়ে।

সাহেব শুধোলেন, 'টোমার নাম কি?'

'জোহরা খাতুন।'

'টোমার বিবাহ হয় নাই?'

লজ্জায় মুখ ঢাকল জোহরা। পালাতে গেল। সাহেব পথ আট্‌কালেন। বললেন, 'হামাকে বিবাহ করিবে? হামি বহুৎ সোনা দিব। টাকা দিব। জমিন দিব।'

জোহরা পালিয়ে গিয়ে দোরগোড়া থেকে বলল, 'সাহেব, তোমার মুখে ছাই!'

শের আলী বলল, 'মিস্টার ফালমন, বিয়ের কথায় বাঙালী মেয়েরা লজ্জাবোধ করে।'

ফৈজি মিয়া বলল, 'তাছাড়া আপনি খ্রীস্টান। মুসলমান-খ্রীস্টানের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি বা সামাজিকতা নেই। হিন্দুরা যেমন মুসলমানরা গরু খায় বলে তাঁদের ছুঁতে ঘৃণা করে, তেমনি খ্রীস্টানরা শূকর খায় বলে মুসলমানরা তাদের ঘৃণা করে।'

সাহেব বললেন 'হিণ্ডুরা ঘোরটর রূপে প্রটিমা পূজারী, এবং মহামেডানরা ঠিক টাহার উল্টা। ক্রিশ্চানদের সহিত মহাম্মডীয়ন্তের বিরোধের আসল কারণ একশট্ বরষ ধরিয়া যে ক্রুসেডের ওয়ার, ছাট মিনস্ যুডট্ হইয়াছিল—টাহার জন্য। নহিলে আপনাডের যে নবী হামাডেরও সেই নবী। এ্যাডম—আডম, নুহ—নোয়া, জন—ইয়াহিয়া, ডেভিড—ডাউড, জোসেফ—ইউসুফ, আব্রাহাম—ইব্রাহিম, মোজেজ—মুসা, যীশু—ঈশা। ব্যাস, হামাডের প্রোফেট শেষ হইয়া গেলেন। টারপর আপনাদের শেষ নবী মহম্মড। অল ক্রম হিব্রু ফলোয়ার্স অব আব্রাহাম—কালচার। আপনারা 'খট্‌না' (ত্বকচ্ছেদন) করেন নাবালক ছেলেদের, ইহা ইহুডীডের মধ্যে ছিল। কারণ সিরিয়া বা মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মুডা নামক এক রকম রোগ হইত। হজরট দেখিলেন এই রোগে পড়িলে টাহার ফলোয়ার্সরা অকালে মরিবে—বেশি সণ্টান উটপাডন করিয়া অডুর ভবিষ্যটে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতে পারিবে না।'

সাহেবকে নারকেল মুড়ি খেতে দিল ফৈজি সেখ। থালায় করে আবার

খাবার দিতে এসেছিল জোহরা খাতুন। লজ্জা আর হাসিভরা চোদ্দ বছরের ফর্সা টুকটুকে মেয়ে।

আবার সাহেব বললেন, 'টুমি হামার বহয়ানী না হও, বহিন হইবে টো?'

জোহরা খাতুন বলল, 'বহিন হইলে কি দিবে?'

'জরুর। টোমাকে হামি গোলড নেকলেস—সোনার হার দিব। টুমি হামাকে 'ভাডা' বলিয়া ডাক।'

'দাদা! তুমি খুব ভাল মানুষ!' বলে জোহরা খাতুন পালিয়ে গেল।

সাহেবের জন্য জাল ফেলে মাছ ধরা, মোরগ জবাই করা হল। ভাত খাবেন তিনি। কৈফি মিয়া বউমাকে ভাল করে মোরগ পোলাও করতে বলল। বড় রুইমাছের কালিয়া, ডিম সিদ্ধ, মটর ডাল, বেগুন-কুমড়ো-পটল ভাজা আর পায়েস। চাটনির ব্যবস্থাও করতে বলে দিলে।

পাইপ টানতে টানতে ফালমন সাহেব বাগান দেখতে গেলেন। একজনের দরওয়াজায় পাতিঘাসের ঝ্যাংলা বোনা দেখলেন। জমি থেকে নোনামাটি চেঁছে এনে হাঁড়িতে ফিলটার করার পর জাল দিয়ে যে অভাবী বুড়িটি নুন করেছে, তাও দেখলেন। খেজুর পাতার চাটাই বোনা আর কাঁথা সেলাই দেখে বললেন, 'খুব গরিব আছে মানুষরা। সাত শত বরষ মুসলমান বাডশারা গরিবদের জন্য কিছু করেন নাই। বিবির টাজমহল বানাইয়াছেন!'

এক বাড়ির রং-চিত্রিত তালপাতার পাখা দেখে সাহেবের বেশ পসন্দ হয়ে গেল। দু-খানা কিনে নিলেন দু-পয়সার জায়গায় চারআনা দিয়ে।

বাগানে এসে পাখি দেখে বললেন, 'বন্দুক আনিলে পাখি শিকার করিতাম।'

শের আলী বলল, 'আমি আপনাকে কথ্য বাংলা শিখিয়ে দেবো মিঃ ফালমন হোম, কেমন করুনি, তাতে আরো মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে পারবেন। সাধু ভাষায় কথা বললে মানুষ হাসে।'

'বেশ টোমাকে হামি চাকরি দিব, টুমি হামাকে কঠ্য বাংলা ভাষা শিখাইবে। হামি করুনি ইংলিশ শিখাইব। টুমি এখন হামাকে থোরা তারি পিলাইবে?'

'ধ্যুৎ! পচা গন্ধ! তাড়ি ভদ্রলোকে খায় নাকি?'

'টুমি মড্ খাইয়াছ?'

'একদিন। গোপনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খেয়েছিলাম কালী পুজোর রাত্রে। হিন্দু বন্ধুরা ডিরোজিও পন্থীদের গুরু বলে মানে। আমরা জাতিধর্মের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে আধুনিক মানুষ হতে চাই। মানব সেবাই আমাদের ধর্ম।'

ফালমন সাহেব বললেন, 'খুব ভাল। লেকিন বহুৎ পড়াশুনা করিতে হইবে।'

দুপুরে খানাপিনা করলেন সাহেব। কাঁটা চামচের ব্যবস্থা ছিল না—হাত দিয়েই খেলেন। বাঁ হাতে কাঁটা হাড় ফেলতে লাগলেন। তবে মেঝেয় 'দস্তরখান' (ফুল কাপড়) পেতে ভাল ভাল থালা-বাসনে খাবার পরিবেশন দেখে বললেন, 'গ্র্যাণ্ড!'

তবে একটি তরকারীতে একটু বেশি ঝাল হওয়াতে সাহেব ঝোল টানতে লাগলেন। বললেন, 'চিলি! ঝাল খাইবার হামার অভ্যাস নাই। মুখরোচক লাগিবার জন্য ঝাল খাইলেও উষ্ণদেশে আমাশা রোগ আক্রমণ করিবে।'

আহারাদির পর ফালমন সাহেব তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বিদায় নিলেন।

অনেক রাত্রে ফিরলেন ফতেহার মোল্লা। ফালমন সাহেবকে বাড়িতে আনার কথায় তিনি স্ত্রীর ওপরে মহা চটে গেলেন। বললেন, 'নচ্ছার, মদখোর, শুয়োর খেকো খ্রীস্টান সাহেবকে বাড়িতে এনে খাতির করা! নীলকুঠির সাহেবটা ভাল মানুষ?'

গোলেনূর বানু বললে, 'নাগো, বাবাজীও বলল, সাহেবটা খুব ভাল লোক। লেখাপড়া জানে।'

'তুমি চুপ করো তো! বাবাজী ঘোড়ার ডিম জানে। ওরা সূ'ই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়। মুসলমানরা দয়া করে এদেশে ওদের ব্যবসা করতে বসালেন আর ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্য দখল করে নিল।'

'সে যখন হয়েছে তখন হয়েছে—এখন আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চলতে হবে তো! সাহেব শের আলীকে নীলকুঠির চাকরি দেবে বলে গেছে।'

'তাহলে তো সোনায় সোহাগা! চাকরি মানে তো গোলামী? কেন প্যাটের ভাতের অভাব পড়েছে?'

গোলেনূর বানু বলল, 'হক কথা বললে তুমি তো রেগে যাবে। বাবাজী কিছু বোঝে না একথা তুমি বললে কেন? তার চেয়ে লেখাপড়া বেশি শিখতে পারো কিন্তু সেই বিদ্যের রোজগারে ক'বিঘে সম্পত্তি কিনতে পেরেছ তুমি? মোল্লাকী আর ইমামতী তোমার বিনা পয়সার, মাদ্রাসার মাইনেও মুরগি পোষার খরচ, ছেলেও সেই রকম রোজগার করবে নাকি?'

ঈশার নামাজ পড়তে লেগে গেলেন ফতেহার মোল্লা—বারোটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।

হোম সাহেবের বন বা সাহেবান বাগিচা, নোদাখালীর ঘোষের বাগানের পুকুরে নীলগাছ পচানো হতে লাগল। কামরা গ্রামের নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে এর আশপাশের গ্রাম গুলোতে চাষীদের বাধ্য করা হল নীল চাষের জন্য।

যে চাষী মান্ধাতা কালের চাষ ছেড়ে নতুন নীলচাষ করতে পুরুত ঠাকুরের প্ররোচনায় পাপ কাজ মনে করে বেঁকে বসল তার কাছে গেল প্রথমে শের আলী ঘোড়ায় চড়ে সাহেবী পোষাক পরে। টাকা দাদন দিতে চাইল। মহারানী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডোয়ার্ড, পঞ্চম জর্জের আমলের কাঁচা রুপোর টাকা থলি থেকে বের করে হাতে নাবিয়ে ঝনঝনালো, তবু যখন রাজি হল না চাষী একদিন কাল্‌মন সাহেব হাজির হলেন বন্দুক আর পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে। অনেক বোঝাবার পর ঠাকুরের-পায়ে-হাত-দিয়ে-শপথকারী-নারাজ চাষীর কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে চাবুক মারতে মারতে টেনে এনে কামরার নীলকুঠির একটা ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হল।

ঘরে তার বউ ছেলেমেয়েরা কাঁদতে লাগল। বারোজন চাষীকে বন্দী করে রাখার তিনদিন পরে তারা রাজি হয়ে দাদন নিয়ে চলে যেতে সাহেবের জন্মদিনের উৎসব এলো। শের আলী ডেকে আনল তার 'ইয়ং বেঙ্গল' বন্ধুদের।

কলকাতা থেকে আসা কেক-বিস্কুট-পাউরুটি-মাখন-পনীর, কলা, আপেল, আঙুর, লেবু, মাংস আর মদ খেলে তারা প্রচুর। এসব এনেছিলেন সাহেবের ভাই মিঃ গ্যারিসন হোম।

তিনি বড় একটা কথাবার্তা বলেন না। খাবার দেবার সময় সাহায্য করলেও গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে থেকে নেটিভ লোকদের ভাবভঙ্গি দেখেন। ঠিক ঘৃণা না হলেও উপেক্ষার দৃষ্টি তাঁর বিড়াল-চোখে। অনবরত তিনি বিড়বিড় করে মুখস্থ বাইবেল পড়েন। সাহেব পাড়ার দোকানে বসে তিনি নীলের ব্যবসা করেন কলকাতায়।

শের আলী কাল্‌মন সাহেবের খুব বিশ্বাসী কর্মী। নবাবজান আর জনার্দন রায়ের দ্বারা পাঁচটি যুবতী বাঈজীকে এনে হাজির করল। তারা নাচগান করল খুব কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে।

বহুলোক বাঈজীদের রং-তামাশা দেখতে এসেছিল চারদিকের পাড়া-গাঁ থেকে।

লোকজন চলে গেল নাচ গানের আসর ভঙ্গ হয়ে যাবার পর। তখন মাঝরাত পার হয়ে গেছে।

পংখীর সঙ্গে শের আলী দৈহিক উত্তাপ কাটিয়ে ঠাণ্ডা হবার পর সকালে নাচনীদের বিদায়-আদায় করে দিল। সাহেবের ভাই চলে যেতে দেখল ফাল্‌মন হোম মুখ গুঁজে বারান্দার টেবিলে পড়ে আছেন। সাহেব কবিতা লেখেন। দেশে তাঁর একজন প্রেমিকা আছেন। মিঃ ফালমন হোম এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের ছেলে। আর তাঁর প্রেমিকা উচ্চবিত্ত ব্যারনের মেয়ে। বংশ আর অর্থ-কৌলিন্যে প্রেমিকাকে তাঁর লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রেমিকার পক্ষ থেকে হতাশা ব্যঞ্জক পত্র পাওয়ায় ভাগ্যান্বেষণে ভারতে চলে আসেন; আগে ছিলেন আসামের চা-বাগানে। পাহাড়ী পাইথনের আক্রমণে আহত হলেও ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়িয়ে কোমরের ছোরা গেঁথে তাকে ঘায়েল করে নিজে রক্তাক্ত শরীরে বাসায় ফিরে এরপর প্রায় একমাস চিকিৎসায় পড়ে থাকেন। সুস্থ হবার পর পাইথনের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচার উদ্বেগজনক কাহিনী লিখে পাঠান প্রেমিকার সহানুভূতি পাবার আশায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর এক লর্ডের সঙ্গে লুসির বিয়ে হয়ে গেছে তখন। তবু লুসি জানিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে ফিরলে তিনি যেন দেখা করেন। তাঁর কথা মনে থাকবে। ফালমন সাহেব এমনিতে খুব লোক ভাল কিন্তু মাঝে মাঝে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর বদমেজাজ প্রেমের ব্যর্থতা থেকেই যে জন্মেছে তা বুঝতে পেরে শের আলী একদিন সাহেবকে ঘাটে ভেড়ালে—যে ঘাটে সোনার রঙের কলসী ভরে নিতে এসেছিল অবস্থাপন্ন জোতদার অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনূঢ়া কন্যা পদ্মিনী। নীলকুঠির চারপাশে ছিল গড়। সেখান দিয়ে বৈঠা বেয়ে জেলে ডিঙিতে চেপে কন্যা কুমারী শীর্ণ নদী দিয়ে হাউড়ি বাহির চড়া, সাহেব বাগিচা হয়ে গ্রামে বা দূর অঞ্চলে যাওয়া যেত। সাহেব সুন্দরবনেও গেছেন কয়েকবার।

নীলকুঠির গড়ের পশ্চিম পারে ঘাটের সামনে মাখলিয়া বাড়ুজ্জে বাড়ির কন্যা জল ভরা কলসী কাঁখে নিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সাহেব হাঁক মেরে উঠলেন, লু—সি—'

শের আলী বলল, 'আপনার লুসি এই রকম দেখতে ছিলেন?'

'জাস্ট লাইক লাভলি লুসি!' সাহেব যেন খুবই উৎফুল্ল।

পদ্মিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—হেঁট মাথায় কোনো কিছু শোনার জন্যে বোধহয় ক্ষণকাল ইতস্তত করছিল।

বৈঠা রেখে ডালপালা-ঝোলা অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে শের আলী বলল, 'আপনি বোধহয় অম্বিকাবাবুর কন্যা?'

হেসে সলজ্জভাবে পদ্মিনী বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

আপনাকে দেখে নীলকুঠির সাহেব ফাল্‌মন সাহেব অবাক হয়ে তাঁর প্রেমিকা লুসি মনে করে হাঁক দিয়ে ফেলেছেন। একেবারেই নাকি এক রকম!'

সাহেবের দিকে তাকাল পদ্মিনী। বলল 'ধন্যবাদ সাহেব, লুসি নয়, আমার নাম পদ্মিনী।'

পদ্মিনী ঘাটের ধাপ বেয়ে উঠে চলে যাচ্ছিল।

শের আলী বলল, 'আপনি বোধহয় কলকাতায় জমিদার মামার বাড়ি থেকে লেখাপড়া শিখেছেন?'

'আপনার আন্দাজ ঠিকই—।'

পদ্মিনী চলে গেল।

অগ্রহায়ণের প্রথম দিকের হালকা শীতের দুপুর রোদ তেমন গায়ে লাগে না। সাদা দুধ সাদা মেঘ ভেসে চলেছে।

শের আলী আর ফাল্‌মন সাহেব দুজনেই নীরব। নীলচাষের জন্যে জোতদার হলেও অম্বিকাচরণকে নীলকুঠিতে ধরে এনে ফালমন সাহেব বলেছিলেন 'গোঁড়া হিন্দু, বুড়ো জরডগব। পরিবর্তন চান না চাষ আবাদের। এক খোঁটায় ঘুরিবে? বেদ উপনিষদে কোথায় আছে নীল চাষ করিতে নাই? আপনি যদি বারো বিঘা জমিতে নীল চাষ না করেন টো আপনাকে আমি কঠিন শাস্তি দিব।'

অম্বিকাবাবু বলেছিলেন, 'আমার শ্যালকও কলকাতায় থাকে, বিখ্যাত জমিদার, তোমার মতো কত সাহেবকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। আমাকে অপমান করলে সে পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়ে তোমার হাড় গোরে পুঁতে দেবে।'

ফালমন সাহেব বলেছিলেন, 'উ-হু-হু-হু···এটক্ষণ বোধহয় তাঁহার ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়া আসিটেছে! হামি কি টবে পলায়ন করিব? জমিনডাররা হামাদের পা চাটা কুট্টা আছেন। আপনি কি টাহা জানেন না? আপনার জমিনে জোর করিয়া হামি নীল চাষ করাইব—ক্ষমটা থাকিলে লাঠিয়াল ডাকিয়া ঠেকাইবেন।'

অম্বিকাবাবু বোধহয় অপমানের জ্বালা জুড়োতে কলকাতায় জমিদার শ্যালকের

কাছে গিয়েছিলেন। এক সপ্তা পরে ফিরে দেখেন বারো বিঘে জমিতে চাষ আবাদ করা হয়ে গেছে নীলের।

শ্যালক নিশ্চয়ই বলেছিলেন, 'গোরা সাহেবদের সঙ্গে লাগবেন না জামাইবাবু—ওঁদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। এখন ওঁরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা!...'

এক বছর পরে নীল কাচা ধোয়া হয়ে যেতে সাহেব বারো বিঘে জমির একশো টাকা আগাম চাষের জন্য দিতে গেলে অম্বিকাবাবু ফেরত দেন।

গোটা গড়টা দু-বার ঘোরার পর হঠাৎ ফালমন সাহেব বললেন, 'এই পদ্মিনীকে আমার চাই শের আলী! যেন তেন প্রকারে। নইলে তোমাকে শালা আমি আল্লার নামে পুড়িয়ে কাবাব করে আমার কুকুরকে খাওয়াব!'

'এবার আপনি চলতি বাংলা শিখে গেছেন। কিন্তু নাচনী মেয়েদের ওপরে আপনার তো কই নজর পড়ল না?'

'আমি ভাগাড়ের মড়া সাফ করা শকুনি নই শের আলী মিয়া! হাজার মেয়েও আমার মন থেকে লুসিকে সরাতে পারবে না! বাট নাউ আই হেজিটেড। ঐ বাঙালী লুসিকে বশে আনতে পারলে তোমাকে আমি পাঁচশো টাকা বখশিস দিব।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। তাঁকে আপনার পাবার জন্যে আল্লার কাছে কাঁদাকাটা করব।'

হা হা করে হাসতে লাগলেন ফাল্‌মন সাহেব। বললেন, 'শালা শূয়োর, তুমি নামাজ পড়ো না। রোজা করো না আর আল্লাকে কেঁদে কেটে ডাকলেই তিনি তোমার কথায় গলে যাবেন?'

শের আলী হাসতে লাগল। বলল, 'পদ্মিনীকে দেখতে কিন্তু ডায়েনা দেবীর মতো!'

একেই বলে শালা ধামাধরা! তুমি স্বরগের দেবী ডায়েনার সঙ্গে পদ্মিনীর তুলনা করায় আমি সমঝেছি আমার থেকে তোমার মন বেশি রসসিক্ত হয়ে গেছে। শিয়াল হয়ে বাঘের খাদ্য খাবে? তুমি শালা পদ্মিনীর ত্রিসীমানায় যাবে না।'

শের আলী বলল, 'ঠিক আছে, ইওর অনার—বাট হাউ ইউ ক্যাচ দা গোল্ডেন ফিস? ইউ আর দা এ্যানটি পারসন অব হার ফাদার।'

সাহেব নীল চোখ মেলে শের আলীর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

কুঠিবাড়িতে এসে ফাল্‌মন সাহেব দোতলার ঘর থেকে কন্যা কুমারীর তীরের

ওপর দিয়ে সাদা কেঁদোচূড়া বকের ঝাঁক সুন্দরবনের দিক থেকে উড়ে চলে যেতে দেখলেন। নদীটি চওড়া হলেও অগভীর—এখন স্রোতধারা তলায় নেমে গেছে—তাই তাঁর বারোটি পাল তোলা সখের জাহাজটি পড়ে আছে। পাখি শিকারের নেশা দেখে শের আলী তাঁকে এমন সময় সুন্দরবনে যাবার কথা জানাল যখন এই শীর্ণা নদী দিয়ে আর হুগলী নদীতে যাওয়া যাবে না। কার্তিক মাসের শেষ দিকে নাকি বড় বড় শকুনের মতো মেলা রাজহাঁস আসে দক্ষিণ মহাসাগরের দিক থেকে সুন্দরবনের ঘাসবনে ডিম পেড়ে বাচ্চা তুলতে। তিন মাস পরে আবার ঠাণ্ডা চলে গেলে বাচ্চাদের নিয়ে কুমেরু অঞ্চলে চলে যাবে।

ফাল্‌মন্‌ সাহেব ভারতে থাকেন, হাঁসদের এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে কেমন করে বোধ হল? ডিম যে কঠিন ঠাণ্ডায় রাজহাঁসদের পালক-ঢাকা পেটের তলার ওমেও গরম হয়ে বাচ্চা জন্মানোয় সহায়ক হবে না তা জেনেই গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার হাল্‌কা শীতে এসে জঙ্গল-জলাশয়ে বাচ্চা তুলে নিয়ে যায়।

মানুষের চেয়ে বোধহয় মৌমাছি, মাছ, পিঁপড়ে, পশু-পাখিদের আরো বেশি প্রকৃতিজ্ঞান কেননা তাদের আবহাওয়ার তারতম্যের ওপরে নির্ভর করে জীবন-ধারণ করতে হয়।

সুপারি বীথির মাঝখানে অম্বিকা ব্যানার্জির দোতলা মাঠকোঠা বাড়িটি বড় সুন্দর দেখায়। চোং খোলা দিয়ে থাক কেটে কেটে ছাওয়া—যেন বড় একটা পাল তোলা জাহাজ।

নীলের পেটিগুলো আগামীকাল পাঠাতে হবে কলকাতায়। গুনটানা নৌকোয় কন্যা কুমারী দিয়ে হুগলী নদীতে চলে যেত। এখন নদীতে চড়া জেগে উঠেছে। নৌকো চলাচল বন্ধ। বর্ষা পড়লে আবার চার-পাঁচমাস নৌকো চলবে। গরুর গাড়ি করে মাল নিয়ে গিয়ে হুগলী নদীর নৌকোয় তুলতে হবে। নদী বেয়ে মাল গিয়ে উঠবে কলকাতার আর্মেনী ঘাটে। সেখান থেকে যাবে অফিস বাড়িতে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এখানের গ্রামের কর্মীরা কাহিল হয়ে একে একে পালিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন শের আলী আর এলো না। সংবাদ এলো তার দাদু ফৈজি সেখ নাকি মৃত্যু শয্যায়।

ঘোড়া নিয়ে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ফাল্‌মন সাহেব ব্রেক ফাস্ট করার পর বের হয়ে এলেন একাই। অম্বিকা বাবুর সঙ্গে তিনি আপস-মীমাংসা করতে চান। যে কোনো শর্তে।

নীলকুঠির সাহেবকে দেখে অম্বিকাবাবুর বাড়ির প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়লেন। বিশেষ করে তাঁর তিনজন জোয়ান ছেলে। তারা ভীতু আর মেয়েলি স্বভাবের। ভাবল তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে সাহেব নীলচাষের জন্য মজুর খাটাবেন। না খাটলে 'কোড়া' (চাবুক) মারবেন।

'অম্বিকা ব্যানার্জি আছেন?' ফাল্‌মন সাহেবের ডাকাডাকিতে পদ্মিনী বেরিয়ে এসে করজোড়ে নমস্কার জানাল। হাসিভরা সপ্রতিভ মূর্তি তার। ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই হাবভাবে, বরং যেন আছে মজার ভাব।

'আসুন সাহেব, বৈঠকখানায় বসুন।'

'ধন্যবাদ মিস ব্যানার্জি। বাবাকে একবার ডাকুন।' সাহেব আরাম কেদারায় বসলেন। বললেন, 'নতুন কোনো শর্ত নয়—কোনো জমিন লিব না। আমি আপনার সৌজন্যে আপনার মাননীয় পিতার সহিত আলাপ করিতে চাই।'

পদ্মিনী বলল, 'যা বলার আমাকে বলুন, বাবা রাগে অপমানে আপনার সামনে আসতে নারাজ।'

'হুম! যদি ক্ষমা ভিক্ষা করি তো আপনার কাছে চাহিলেই হইবে?' সাহেব বুঝলেন তিনি সাধু আর কথ্যভাষা গুলিয়ে ফেলেছেন। শরীরে মনে তাঁর এক রকম স্পন্দন শিহরণ হচ্ছে।

সাহেব বিনয় বিহ্বল নীল চোখের মিনতি দেখে পদ্মিনী মৃদু হাসল টেপা দুটি ঠোঁটে। তার চিবুকের দু-দিকে টোল পড়ল। থুৎনির ওপরের তিলটি বড় চমৎকার দেখায়। পদ্মিনী বলল, ক্ষমা যদি চাইতে হয় তবে অবশ্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ বাবার কাছেই চাইতে হবে—আমার কাছে চাইলে লজ্জার কারণ হবে।'

'ঠিক লুসির মতো আপনার ধরণ ধারণ। তারও এমনি তিল আছে। তবে লাল তিল। আপনাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি খুব রূপবতী কন্যা আছেন।'

'আপনি বসুন—বাবাকে আনার চেষ্টা করছি।'

'আপনি অশেষ দয়াবতী মহিলা আছেন।' ঘাড় ফিরিয়ে হেসে দিয়ে গজ-গামিনী পদ্মিনী ভেতরে চলে গেল।

সাহেব দেখলেন দেয়ালের কুলজিতে বসে হাতির শুঁড় নিয়ে একটি ভুঁড়িওয়ালা মানুষ সাদা ড্যাবডেবে চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। গণপতি গণেশ! যিনি গণপতি বা রাষ্ট্রনায়ক হন তাঁর মাথাটি হয় পশুর। এই হিন্দুদর্শন স্বীকার

করা যায় কি না? তবে বাহন ইঁদুরটি সম্পর্কে কোনো রকম দ্বিধা নেই। গণেশের শুঁড়টি সব কিছু আত্মসাৎ করার প্রতীক, আর ভুঁড়িটি ভোগের?

অম্বিকাচরণ ব্যানার্জি উড়নি গায়ে দিয়ে মেদযুক্ত লম্বাটে চেহারায় পৈতে ঝুলিয়ে এসে দাঁড়ালে ফাল্‌মন সাহেব উঠে সালাম বাজালেন। বললেন, 'আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। আপনার বারো বিঘা জমিন আপনি ফেরত নিন। আর যে কয় বরষ আমি নীল চাষ করেছি ক্ষতিপুরণ বাবদ যা চাইবেন তাই দিব।'

অম্বিকাচরণ তক্তাপোষে বসলেন। বললেন, 'সাহেব, আপনাদের দেশেও মানী লোকরা আছেন। তাঁদের কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে যে-রকম অপমানবোধ করেন আমাদেরও সেই একই অপমানের জ্বালা আছে। এটা সহজে ভোলা যায় না। ভেবেছিলাম আপনি সদ্বোংশজাত সন্তান নন। যেহেতু ইংরেজ শাসক, তাই মুচি-মেথর হলেও এদেশে এসে উদ্ধত ভাব দেখিয়ে পশুর মতো জীবনযাপন করতেও তাঁদের লজ্জা হয় না।'

'না ঠাকুর মশায়, আমি মুচি-মেথরের সন্তান নয়। আমার বাবা জাহাজের ক্যাপ্টেন। যাহোক, আমি অন্যায় করেছি, গালি দিন। আমি আপনার কাছে অবনত মস্তকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।'

সাহেব হাঁটুর কাছে নিচু হয়ে বসলে পাছে ছুঁয়ে দেন আর স্নান করতে হয় সেজন্য অম্বিকাবাবু একটু সরে এসেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ক্ষমা করছি। ক্ষতিপূরণ বাবদ যা দিচ্ছেন দিন আর জমিতে যেমন নীলচাষ করছেন করুন।'

'হিসাব করুন. সাত বরষে বিঘা প্রতি ধান ও খরে কত টাকা প্রাপ্য হয়। এক টাকা ধানের মণ, দশ মণ বিঘায় ধান হলে দশ টাকা। বারো বিঘায় একশত কুড়ি টাকা। তাকে সাতগুণ করলে আটশত চল্লিশ টাকা। আর বিচালীর দাম। আপনি এক হাজার টাকা দয়া করে গ্রহণ করুন।'

'ঠিক আছে—তাই দেবেন।'

'আপনি রসিদে সই করে দেবেন—আমি টাকা দিয়ে যাব আজ বৈকালে।'

পদ্মিনী থালায় করে নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, বেগুনী আর হামাই ধানের ফুল্‌কো মুড়ি এনে একটা তেপায়ায় বসিয়ে দিল। একঘটি জলও দিল। বলল, 'খান মিঃ হোম, বাঙালীদের বাড়ির খাদ্য আপনার পছন্দ হবে কিনা জানিনা।'

সাহেব বললেন, 'আমি ভাত-ডাঁটা-মাছ-ডাল সব খাই এসব আহারে আমার অসুবিধা নাই।'

সাহেব দু-হাতেই খেতে লাগলেন।

অম্বিকাচরণ খুশী মনে অন্দরে চলে গেলেন।

মেয়েরা এবার উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। সাহেব একবার তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই তারা পালিয়ে গেল। সাহেব ভয় দেখালেন বাচ্চাদের। তারা ককিয়ে উঠে আছাড় খেয়ে পড়ে দৌড় মারলে পদ্মিনী হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দেয়।

সাহেব বলেন, 'আপনার বিবাহ হয় নাই কেন?'

'ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিদায় করতে অনেক মালকড়ি বার করতে হয়, পুত্র হলে অনেক কিছু ঘরে আনে বিয়ের সময়। বাবার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। কাকাদের সঙ্গে জমিজমা ভাগ হয়ে গেছে। তাঁরা দেবোত্তর সম্পত্তির ভাগ বেশি করে দখল নিয়ে বসে আছেন। মামারা আমার বিয়ের জন্য বর্ধমানের মহারাজার বাড়ি দেখাশুনো চালিয়ে ছিলেন। তাঁরা দুটো হাতি, কুড়িটা ঘোড়া, একমণ সোনা, পাঁচমণ রুপো একসের হীরে চান। তারপর আরো ষোড়শদান আছে।'

'তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ?'

'হ্যাঁ, বি. এ. পাশ করেছি। কলকাতায় থাকতাম।'

'তবে আর হাতি-ঘোড়ার বিয়ে করে পরাধীন করদ রাজার বাটির বধূ না হয়ে সংস্কারমুক্ত হয়ে আসল রাজার গলায় মালা দিন।'

পদ্মিনী বুঝল আসল রাজা ইংরেজ—সেই ইংগিতই সাহেব করছেন।

সাহেব আবার বললেন, 'মেয়েরা হল কলমের গাছ। একডাল থেকে কেটে অন্য জায়গার ভূমিতে লাগাতে হয়। তাতে আর মায়া কিসের? বাবা কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেলেই ভার মুক্ত হন।'

'আপনার তুলনাটি ভাল। আপনি এত ভাল বাংলা বলতে শিখলেন কি করে?'

'শিখেছি। আগে সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার করতাম। সেটা শের আলী শুধরে দেয়। তবে 'বাঙাল'দের ভাষা আমি বুঝতে পারি না।'

'আমরাও বুঝতে পারি না। আসছি সাহেব, হাত ধোবেন না।' পদ্মিনী অন্দরে গেল, কিছুক্ষণ পরে পায়েস আর গরম দুধ এনে দিল।

পায়েস খেয়ে দেখে সাহেব বললেন, 'খুব ভাল। ভারি সুগন্ধ আর স্বাদযুক্ত!'

'দুধটা খেয়ে নিন।'

'ভুঁড়ি হয়ে যাবে না, ঐ গণেশজীর মতো?'

হাসতে লাগল পদ্মিনী।

সাহেব বললেন, 'অবশ্য গণেশজীর ভুঁড়ি যতই বাড়ুক, ক্ষতি নাই। ওনার স্ত্রীলোক হলেন কলাবউ!'

'আপনারও তো বউ নেই।'

'নেই, তবে হবে তো! কপালে না থাকলে ভাল বউ জোটে না। আমার লুসি অন্যের হয়ে গেল। মেয়েদের বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। উঠি আমি—বহুৎ ধন্যবাদ।'

'আবার আসবেন।'

'হাঁ সন্ধ্যার আগে টাকা নিয়ে আবার আসব। তোমাকে নদীর ঘাটে দেখে আমি বহুৎ মুগ্ধ হয়ে গেছি। তোমার বাবার সহিত আপস করে বহুৎ ভাল লাগল। এরজন্য তোমাকে প্রণাম জানাই।'

সাহেব হাঁটু গেড়ে পায়ে হাত দিতেই যেন শিউরে উঠল পদ্মিনী। কেউ নেই দেখে মাথায় হাত দিলে।

সাহেব উঠে হঠাৎ বাঁ হাতখানা ধরে তাতে চুম্বন করে দিলেন।

পদ্মিনী চট করে হাত টেনে নিয়ে ক্রোধকুপিত সলজ্জ চোখে তাকালেও তার মনের আনন্দ হাসি হয়ে বেরিয়ে গেল ঠোঁটে।

সাহেবও হাসলেন। গটমট করে গিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন। হাত তুলে দেখিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পদ্মিনী দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

খ্রীস্টানদের ঠোঁটের ছোঁয়া এখনো যেন তার বাঁ-হাতে লেগে রয়েছে।

তার শিব ঠাকুরের কথা মনে হল। শিবের মতোই দেখতে নীলকুঠির ফালমন সাহেব। নীল চোখে তাঁর যেমন দৃষ্টির উজ্জ্বলতা, তেমনি তীক্ষ্ণতা কিন্তু প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় স্নিগ্ধ মধুর।

পদ্মিনী বুঝতে পারে তার জন্যই আজ তার বাবার পায়ের কাছে বসে ক্ষমা চাইতে এলেন নীলকুঠির ক্ষমতাশালী সাহেব। একজন সাহেবকে মারলে হাজার দু-হাজার সাহেব, গোরা পল্টন কামান বন্দুক নিয়ে ছুটে আসবে—এদের ঐক্য আর স্বজাতি প্রীতি কতখানি!

বাড়িতে আসতে অম্বিকাবাবু বললেন, 'নীলকুঠির সাহেব লোকটা খুব খারাপ

নয়। আমার নিজের শ্যালক ক্ষমতাশালী জমিদার হওয়া সত্ত্বেও যে সাহেবের অপমান অত্যাচার সহ্য করে গেলেন সেই সাহেবই পায়ের কাছে অবনত হয়ে গেলেন! এঁদের চরিত্রে মহত্ত্ব আছে। নাহলে এজাতটা এত বড় হয়!'

পদ্মিনী এক কোঁচড় হলুদ গাঁদাফুল তুলে দোতলার বারান্দায় বসে মালা গেঁথে রাখল। তার বুকের ভেতর থেকে কেবল আনন্দের ঢেউ যেন গান হয়ে উঠে আসছিল। চোখে ভাসছিল নীল দুটি চোখ!

অবেলার দিকে যখন চাষীবাসীরা গরু নিয়ে ফিরছিল, ফিরছিল কাস্তে হাতে ক্ষেতের ধান কাটার কাজ করে, পাখিরা কুলায়ের দিকে ফিরে যাচ্ছিল কলরব করে—ঘোড়ায় চড়েই আবার এলেন ফাল্‌মন সাহেব। পরনে নীল প্যাণ্ট, ওপরে লাল জামা, তার ওপরে ওভারঅল। মাথায় খাকি কাপড় ঢাকা শোলার হ্যাট। পায়ে মোজা আর মজবুত বুট জুতো। কোমরে তলোয়ার নেই কিন্তু পিস্তুল আছে।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে ফালমন সাহেব। বৈঠকখানায় এসে ইজি চেয়ারে বসে পড়লেন। চামড়ার ব্যাগ থেকে চৌকির ওপরে কাঁচা টাকা ঢেলে থাক দিতে লাগলেন। অম্বিকাবাবু এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাতেই সাহব উঠে পড়ে নমস্কার করলেন। বললেন, ' নিন বাবু, টাকাগুলো নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন।'

অম্বিকাবাবু বললেন, 'আপনারা ইংরেজ—যা বলেন, তাই করেন। বাঙালীরা হলে একমাসেও আর আসত না। মান-সম্মান খুইয়ে আমাকে দৌড়তে বাধ্য করতেন।'

সাহেব একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে সই করতে বললেন। অম্বিকাবাবু ইংরেজি যা জানেন তা সামান্যই, পড়তে পারেন, মানে করতে পারেন না। সাহেব যদি ফন্দি করে বারো বিঘে জমি হাজার টাকায় লিখে নেন? তাই পদ্মিনীকে তিনি ডাকলেন।

পদ্মিনী এলে একচোখ তাকিয়ে হেসে দিলেন সাহেব। অম্বিকাবাবু বললেন, 'দেখ না মা পড়ে, সাহেব সই করতে বলছেন।'

পদ্মিনী রসিদটা দেখে ঠিক জায়গায় সই করিয়ে নিল। টাকাগুলো চাদরের প্রান্তদেশে বেঁধে নিয়ে ভেতরে চলে যেতেই পদ্মিনী বলল, 'কি খাবেন বলুন?'

'যা খেলে আদৌ পেট ভরে না অথচ মন ভরে।'

'মন ভরানোর কাজ লুসির জন্যই থাক।'

'সে আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে গেছে—সুদর্শনা নাগিনীর মতো সে শুধু অতীতের পথে স্মৃতির খোলস ফেলে রেখে গেছে।'

পদ্মিনী বলল, 'আপনার তুলনাটা ভারি চমৎকার!'

বাড়ির বুড়ো কাজের লোকটি একথালা ফুলকো লুচি আর নারকেলের ছাঁই, বেগুন পটল ভাজা এনে হাজির করল। বড় আকারের পাকা পেঁপে কেটে এনে দিলে।

সাহেব বললেন, 'একটু ব্যস্ত আছি মিস ব্যানার্জি। এখনি উঠব। সাহেবান বাগিচার চাষীরা তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে নীলগাছ পচানোর পুকুরে মরা গরু ফেলে দিয়ে গেছে। তাই নিয়ে আমার লোকদের সঙ্গে বচসা হলে তাদের মারপিট করেছে। ক্ষেতের নীলগাছ উপড়ে ফেলে দিয়েছে।'

পদ্মিনী বলল, 'আপনি গিয়ে মাতালদের কুঁড়েঘরগুলোয়—আগুন লাগিয়ে দেবেন?'

'হঁ্যা, তাই দেবো।'

'না, দেবেন না। ওরা অশিক্ষিত গরিব মানুষ। নীলচাষে বড়বড় পুকুরের জল নষ্ট হচ্ছে। মানুষ জল পায় না। মশার আমদানি বেশি হয়েছে। ম্যালেরিয়া জ্বর হচ্ছে ব্যাপকভাবে।'

'ঠিক ঠিক। কলেরা-বসন্তর মহামারিতেও বহুলোক মারা যায়—জল খুব খারাপ হয়। বড় বড় জলাশয় করা উচিত। মশা মারা দরকার। ঠিক আছে ধরে এনে শুনব ওদের অভিযোগ কি আছে। আর একটি শোক সংবাদ আছে। শের আলীর দাদু ফৈজি সেখ মারা গেছেন মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ার সময়। আমাকে সেখানেও একবার যেতে হবে। চলি এখন। বাই। আবার দেখা হবে।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। আলো আনছিল কাজের লোকটি। সাহেব নেমে পড়লেন।

ঘোড়ায় চড়লেন সাহেব।

মুখ-আঁধারী সন্ধ্যায় হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে পদ্মিনী অনুচ্চস্বরে বলল, 'সাহেব, লুসির পক্ষ থেকে আমি আপনাকে গন্ধহীন এই গাঁদার মালাটি উপহার দিলাম।'

মাসাটি ছুঁড়ে দিতে লুফে নিলেন ফাল্‌মন সাহেব। বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ দেবী!'

ঘোড়া ছুটিয়ে সাহেব চলে গেলেন যখন অম্বিকাবাবু এসে দাঁড়ালেন বাইরে। বললেন, 'সাহেব চলে গেলেন?'

পদ্মিনী কোনো কিছু উত্তর না দিয়ে ভেতরে এসে শাঁখে ফুঁ দিতে লাগল।

তারপর দোতলার ঘরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল শরীর ভাল নেই, কিছু খাবে না বলে।

সে শুধু সারারাত ভাববে। সে কি এখন লুসি হয়ে গেছে?

[১৩]

শের আলীর ওপরে গ্রামের মুসলমানরা খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। তার বাবা ফতেহার মিয়াই এই অসন্তোষের আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছেন। তিনিই লোকের কাছে বলেছেন, 'আমার বড় ব্যাটা শের আলী লেখাপড়া শিখে 'অমানুষ' হয়ে গেছে। রমজান মাসে রোজা করে না, নামাজ পড়ে না, হাল-হারাম সব কিছু খেয়ে বেড়ায়। আমার বাপ বুড়ো আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। শের আলী আমার অবাধ্য। মদ খায়, শুয়োর খায় নীলকুঠির সাহেবের পাল্লায় পড়ে। সাহেব খুব খারাপ চরিত্রের লোক। আমার মেয়ে জোহরা খাতুনের দিকে চোখ ফেলেছিল। একটা সরু সোনার হার পাঠিয়েছিল 'বুন' সম্পর্ক পাতানোর জন্যে—ফেরত দিয়েছি। ঐ ফালমন সাহেব নাকি শের আলীকে বলেছে 'মুসলমানরা দাসীর পুত্র। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের (দঃ) বিবি সারার বাঁদী ছিলেন হাজেরা বিবি। বাঁদীও যে স্ত্রী রূপে পালিত হতেন সে কথা স্বীকার না করে বলে হজরত ইব্রাহিম (দঃ) যেহেতু হাজেরা বিবিকে বৈধমতে বিবাহ করেন নি আর স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ে সারা বিবি নির্যাতন করতে থাকলে যেখানে মক্কা নগরী হয়েছে সেখানের বনবাসে রেখে আসেন। ঐ হাজেরা বিবির গর্ভে হজরত ইসমাইল (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন এঁরই বংশধর হজরত মোহম্মদ (সাঃ) সারা বিবির গর্ভজাত হজরত ইসাহক (দঃ)। যাহোক ফাল্‌মন সাহেব বা খ্রীষ্টানরা শের আলীর মতো লোভী কুত্তাদের খাইয়ে-দাইয়ে এইভাবে হেনেস্তার কথা শোনায়।'

ফৈজি সেখ তখন বেঁচে—এসব কথা শুনে বলেছিল, জন্মের জন্য কেউ দোষী নয়। কর্মই আসল কথা।'

ফৈজি সেখ মারা গেল মসজিদের মধ্যে—নামাজ পড়া অবস্থায়—সবাই তাকে কবর দিতে এলো।

শের আলী বসে বসে কাঁদছিল। তার আর তিনভাই বদর জাফর আর জয়নুল কিন্তু দাদুর জন্য ততটা শোকার্ত নয়। কেবল জোহরা খাতুন কাঁদছিল মাথা কুটে কুটে। গম্ভীর মেজাজে মাথায় কিস্তির টুপি লাগিয়ে কাফন সেলাই করছিলেন ফতেহার মিয়া। তিনি জানতেন সব মানুষই মৃত্যুর অধীন। শোক-উচ্ছ্বাস শরিয়তে অবৈধ। তবে বাবা যা রেখে গেছে তার জন্য লোক দেখানো একটু না কাঁদলেও ভাল দেখায় না। মাঝে মাঝে তিনি চোখের জল মুছছিলেন।

এক মৌলবী এসে তাঁকে তুলে দিলেন। বললেন, 'চোখের পানি কাফনে ফেলতে নেই।'

ফৈজি সেখের স্ত্রী আস্‌মা খাতুন হাত-পা ছড়িয়ে বসে কান্নাকাটি করতে থাকলে শের আলী এসে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে ঘরের মধ্যে। আস্‌মার চেহারা মোটা হয়েছে—মাথার চুল পেকেছে কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তার বুক এখনো যথেষ্ট স্থূল। তার বুকে শের আলী কান্না ভরা মুখ রাখে। বুড়ির বিলাপ অতীত স্মৃতিকথা নিয়ে।

এমন সময় ফাল্‌মন সাহেব তাঁর সাদা ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে হাজির হলেন।

মুসলমানরা সবাই তখন সন্ত্রস্ত এবং অসন্তুষ্ট।

খবর পেয়ে শের আলী বেরিয়ে গেল বাইরে। মশাল জ্বলছে। মুসলমানরা দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

শের আলী সালাম বাজাল।

সাহেব নেমে পড়লেন। ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি করে উঠল।

শের আলী বলল, 'আপনি কি দাদুর কবরে মাটি দিতে চান? অপেক্ষা করবেন?'

হাঁ তাই আমার ইচ্ছা।

'না সাহেব, আপনি মাটি দিতে যাবেন না। মুসলমানরা অসন্তুষ্ট। আপনারা যীশুকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলেন—আল্লা লা-শরীক—তিনি নিরাকার—তার পুত্র-সন্তান বা উত্তরাধিকারী কেউ নেই। আপনারা 'হারাম' (অপবিত্র)

মদ আর শূকর খান। সেজন্য কবর স্পর্শ করা বা আপনার হাতের মাটিও হারাম জ্ঞান করে মুসলমানরা।'

ফালমন সাহেব 'হুম' বলে একটা শব্দ করে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। বললেন, 'নীলকুঠির পুকুরে সেখানকার লোকরা মরা গরু ফেলে দিয়েছে। তাই নিয়ে আমাদের লোকদের সঙ্গে মারপিট হয়েছে। আমি যাচ্ছি সেখানে।'

'একাই যাবেন?'

হাসলেন সাহেব। ইংরেজিতে বললেন, 'আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি না। ওখানের লোকদের কি অভিযোগ শুনব। পদ্মিনীর কথা ঠিকই পানীয় বা ব্যবহারের যোগ্য জল আমরা নষ্ট করছি আর মশার প্রাচুর্যে ম্যালেরিয়া রোগ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এর প্রতিবিধান দরকার। যদি তা না করতে পারি তবে নীলচাষ বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোম্পানী খুলব। তুমি কাল এসো।'

সাহেব চলে গেলেন।

পদ্মিনীর ব্যাপারটা শের আলীর মাথায় ঘুরতে লাগল। সাহেবের সঙ্গে তাহলে পদ্মিনীর দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ আলোচনা হয়েছে।

পরদিন নীলকুঠিতে বেরুবার সময় ফতেহার মিয়া বললেন, 'তোর দাদুর চাল্লিশের খানা না-হওয়া পর্যন্ত মদ খাবি না। অসংযত ভাবে থাকবি না। আমি 'খতম' পড়াব। ধর্মকর্ম করব। সব ভেস্তে যাবে তাহলে। তুই মানুষ হ। নামাজ পড়। সাহেবের চাকরি ছাড়। হিন্দু মুসলমান চাষীবাসী সবাই তোর ওপরে অসন্তুষ্ট। তুই নাকি সাহেবের চেলা হয়ে অত্যাচার চালাস্। তোর বিয়ে দোব—সংসারী হ।'

শের আলী কোনো কথাই উত্তর দিল না। ঘোড়ার পেটের তলায় পা দিয়ে আঘাত করতেই সে লাফিয়ে উঠে খামারে পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল।

নীলকুঠিতে এসে দেখল সাহেব অন্যমনস্কভাবে বসে পাইপ টানছেন আর বোধহয় কবিতা লিখছেন। শের আলী সালাম জানাতে ইঙ্গিতে বসতে জানালেন। পাখির পালকের কলমে আরো দু-লাইন লেখার পর ইংরেজি কবিতাটি পড়ে শোনালেন এবং বাংলায় মর্মার্থ করে দিলেন :

> আমি দেখেছি বাংলার নীল আকাশে
> মেঘের মতো বিচরণশীল মেঘেদের।
> দেখেছি, স্ফটিক স্বচ্ছ হিমজমা শিশির বিন্দু দুলতে
> সবুজ নরম দূর্বাঘাসের ডগায়।

প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়েছি ঝরা শিউলি
আর বকুলের।
দেখেছি চৈত্রের মাটিফাটা তৃষ্ণায় কাতর পক্ষদের চাহনি।
মাটির কুঁড়েঘরে কালো কালো মানুষদের দুঃখভোগ।
ঝরা ধান আর গোবর কুড়োয় বাচ্চারা।
নদীতে বর্ষায় জল থইথই—
নীল পচানো দূষিত জলে মশা-ম্যালেরিয়া
জ্বরে ধোঁকে মানুষ কুঁড়ের মধ্যে ময়লা কাঁথায়
তবু জলের ঘাটে হঠাৎ এখানেই যেন মাটি ফুঁড়ে
দেখা দেয় পদ্মিনী—
স্কটল্যাণ্ডের সেই লুসি ঘাসের ওপর শিশির বিন্দু।
ইচ্ছে করে সূর্যরশ্মি হয়ে তার বুকে ঝলমল করি—
কিন্তু তার চুল মেঘ হয়ে ঢেকে দেয় সূর্যকে।

শের আলী বলল, দারুণ। খুব ভাল কবিতা হয়েছে স্যার। কিন্তু মেঘটাকে আর ঢেকে দেবেন না।'

সাহেব উঠে পায়চারি করলেন। বললেন, 'ঠিক। মেঘটা আমার কল্পনার অথবা সন্দেহের। আমি বোধহয় একটু দুঃখবাদী। পদ্মিনী আমাকে ঐ হলুদ গাঁদার মালাটি দিয়েছে লুসির হয়ে।'

'লুসির হয়ে কেন?'

'ব্রীড়া! লজ্জা! বাঙালী মেয়েদের নম্র লজ্জা আমার খুব ভাল লাগে। শালা তোমরা যেসব নাচনী এনেছিলে আমার জন্মদিনে, দিনটাই দূষিত করে দিয়েছে তারা।'

শের আলীর চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ নেই কেন? কেন গোপন বিষণ্ণতা? ওরও লোভ আছে নাকি পদ্মিনীর দিকে?

ফালমন সাহেব পাইপ ধরালেন। বললেন, 'তোমার চাকরি এবার বোধহয় শেষ হয়ে যাবে শের আলী। কারণ পদ্মিনীকে আমি চাই-ই। আমার ভাই বিরুদ্ধতা করতে পারে। হিন্দু সমাজ বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই নীলচাষ উঠিয়ে দিয়ে চলে যাব। খুব সম্ভব আমি রেল কোম্পানীতে চাকরি নেব। আর্মেনী ঘাটে যেখানে ক্রেনে করে মোকামের মাল নামানো হয় উল্টোদিকে হাওড়ায় সেখানে বার্ন কোম্পানী লোহা ঢালাই করে গাড়ি, রেল, সেতু তৈরি

করে। পরে ঐ রকম একটা ব্যবসা খুলব যদি টাকার যোগাড় করতে পারি। কিছুই এখন ঠিক নেই। পদ্মিনী আমার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে।'

শের আলী বলল, 'আমি তাহলে কি করব ?

'তুমি সাদি করবে, সন্তান উৎপাদন করবে, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করবে, যেমন তোমাদের সবাই করেছেন। এখন যাও, কাজকাম দেখ গিয়ে। নীলের প্যাকেটগুলো নৌকোয় তোলার ব্যবস্থা করো আর তুমি আজ যাবে কলকাতায়। ভাই গ্যারিসনের কাছ থেকে দু-হাজার টাকা আনবে।'

শের আলী চলে গেল।

সন্ধ্যার আগে হুগলী নদীর দিকে নীলের প্যাকেট ভরা গরুর গাড়ি চলে যেতে ফাল্‌মন সাহেব ঘোড়া নিয়ে বের হলেন। হাতে তাঁর বন্দুক। অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পিছন দিকের আম-জাম-জামরুল-লিচু পেয়ারা-কদম-বেল-নারকেল-বাঁশ-তালগাছে ভরা বাগানের মধ্যে তিনি পাখি শিকার করতে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল শিমুল গাছের ডালে বসে আসে দুটো বড় আকারের শামুকখোল পাখি। এরা খুবই ধারালো চঞ্চু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর ভীষণ স্বভাবের। জলে ভাসে যখন দূর থেকে মনে হবে যেন কেউটে সাপ ফণা তুলে এগোচ্ছে। মানুষের একটু সাড়া পেলেই ডুবে যায়। অনেকটা মানিকজোড়ের মতোই দেখতে। ওড়ার সময় দীর্ঘ পা আর ঠোঁট লম্বা করে থাকে।

গুলী করতেই একটা শামুকখোল উড়ে পালাল আর একটা আর্তস্বর তুলে ঘুড়ির মতো পাক খেতে খেতে বাঁড়ুজ্জে বাড়ির দিকে গিয়ে পড়ল।

বন্দুকের শব্দ শুনে বাগানের দিকে পদ্মিনী উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিল খিড়কির পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তারই সামনে এসে পড়ল আহত পাখিটা। রক্ত ঝরছে তার শরীর থেকে।

ডানা ধরে তুলতে গেলে পাখিটা ক্রুদ্ধ হয়ে ঠোকর বসাতে গিয়ে অক্ষমতায় লুটিয়ে পড়লেও আর্তস্বরে পা দিয়ে আঁচড়ে দিলে।

পদ্মিনীর হাত কেটে রক্ত বার হল।

ফাল্‌মন সাহেবকে দূরে পাখি খুঁজে বেড়াতে দেখতে পেলে সে।

পাখিটা তখন নিস্তেজ হয়ে গেছে প্রায়। ঠ্যাং ধরে চাগিয়ে নিয়ে সে বাগানের ভেতর এগোল।

সাহেবের হাতে বন্দুক—তাঁকে দেখলে সবাই পালিয়ে যায় বা লুকিয়ে পড়ে।

বিশেষ করে পদ্মিনীর ভাইরা। বৌদিরা বলে, 'তুমি কি ডাকাবুকো ঠাকুরঝি! সাহেবকে দেখে একটুও ভয় পাও না?'

পদ্মিনী বলেছিল রগড় করার জন্যে, 'সাহেব বলেছে তোমার বৌদিদের সঙ্গে আমি পিয়ার করতে চাই।'

সাহেব পদ্মিনীকে পাখি ঝুলিয়ে নিয়ে আসতে দেখে আনন্দে বলে উঠলেন, 'ডার্লিং, মাই লুসি! ক্ষমা করুন আপনাদের বাগানের পাখি মেরেছি।'

'কত রক্ত! দেখুন, ঠোঁট বেয়ে ঝরে পড়ছে! পাখি মারতে আছে?

'আপনার কোমল হৃদয়। কষ্ট হয়। আমারও আগে হতো। তারপর এখন আর হয় না। তাহলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে সাধু হতে হয়।'

'বেশ তো সাধু হয়ে যান।' বলল পদ্মিনী। বাঁশ বনের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে পিঠে মানুষের বসবাস নেই।

'সাধুরাও কি শাক-সবজি ভোজন করেন না? তাদেরও তো প্রাণ আছে। সাধুরা হাঁটার সময় তাঁদের পায়ের তলায় কত অদৃশ্য পোকা-মাকড় মরে যায়। সত্যকার সাধুর তো পৃথিবীতে বাস করা চলে না।

পাছে বাগানের এদিকটায় মানুষজন তাঁদের দেখতে পায় তাই পদ্মিনী বলল, 'ঠিক আছে, সাধু হয়ে আর কাজ নেই। পাখি শিকার করে যদি আনন্দ পান, চলুন, দেখাচ্ছি তাদের আড্ডা। এই বাগানের উত্তর পশ্চিমে একটা জলাশয়ে নলখাগড়া আর হোগলা বন। সেখানে অনেক পাখি। ডিম পাড়ে বাচ্চা তোলে। তবে অনেক সাপও আছে।'

বাগানের শেষপ্রান্তে যেন অরণ্যের নির্জনতা। কাঁটা বাঁশের জঙ্গল। বাবুই পাখির বাসা ঝুলছে পুরুলের জালির মতো।

বাজপড়া মরা তালগাছের কোটরের চারপাশে চন্দনা আর টিয়াদের ভিড়। ডাকছে তারা কর্কশ শব্দে বাতাস চিরে।

দোয়েল পাখির জোড়া চেঁচামেচি করে—কাছেই কোথাও বোধ হয় তাদের বাসা আছে।

নলখাগড়ার ঝাড়, হোগলা আর কাঠশোলা ভরা জলাভূমিতে প্রচুর পাখি—যারা জলে চরে মাছ খায়—তাদের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। পানকৌড়ি, ডাহুক, শামুকখোল, মানিকজোড়, জলপিপি, মেছো বক। আর ফাল্‌মন সাহেব দেখলেন উড়ন্ত ছোট আকারের বালিহাঁস—যারা সুন্দরবন এলাকার জলাশয়ে বেশি থাকে। বেশি দূর উড়তে পারে না। ঝুপঝুপ করে জলে পড়ে।

ফালমন এখন পাখি শিকার করবেন, না পদ্মিনীর দিকে মন দেবেন ?

পদ্মিনী বলল, 'জলাশয়ে এখন আধহাঁটু জল। বিলুশে কই-মাগুর-শিঙি-শোল-ল্যাঠা-ট্যাংরা পুঁটি-চিংড়ি-চুনোমাছ আছে প্রচুর। তাই খড়ি-জঙ্গলে গোখরো, খরিশ, ব্যানাফুলী, উদয়নাগ, করাতে জাতীয় বিষধর কেউটে সাপও আছে।'

ফালমন বললেন, 'এখানে এত পাখি! কই, আমাকে কেউ সন্ধান দেয় নি তো। ঐ তো শালুক-পদ্মবনে বালিহাঁস দুটো—মারব ?'

পদ্মিনী হাসল। বলল, 'আনবেন কি করে ?'

'সেটা তো একটা সমস্যা আছে।'

পদ্মিনী বলল, 'মাছ শিকারীরা ছাড়া এদিকে বড় একটা কেউ আসে না। বাবা বলেন, বামাচরণ সরদার, যে রমানাথ সরদার ফৈজি সেখ হয়েছিল তার বাবা এখানে মাছ ধরত। সেই নলখাগড়া বা শরখড়ি, হোগলা, কাঠশোলা কাটত। ছিপ, আটল, ঘুনি, পোলো বা ছাকনি জালে রাজ্যের মাছ ধরত।'

ফালমন সাহেব নিচু গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে পাখি ওড়া, তাদের ডাকের দিকে চোখ আর কান রাখলেও মন ছিল পদ্মিনীর দিকেই।

পদ্মিনী বলল, 'ভয়ঙ্কর এই জায়গাটা!'

হ্যাঁ। ভয় করছে আমার! দেখুন, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে!'

ফালমন সাহেব বললেন, 'গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠাকে 'গায়ে-কাঁটা-দেওয়া বলে ?'

হাতের ওপরে হাত বুলিয়ে দিলেন ফালমন সাহেব। পদ্মিনী হাসল। বলল, 'এবার আমি পালাই। বাবা মা বকাবকি করবেন।'

খানিকটা হেঁটে আসার পর পাতা ঝরা ফাঁকা জঙ্গলঘেরা একটা জায়গায় বসে পড়লেন ফালমন সাহেব। ঝরা পাতার গুমোট গন্ধ। বাতাসে মর্মর ধ্বনি। পাখিদের কল-কাকলি।

পদ্মিনীকেও হাত ধরে টেনে বসালেন তিনি। মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে লজ্জায় হেসে মাথা নামায় পদ্মিনী।

ফালমন বলেন, 'আপনাকে ভগবান নিজের হাতে তিল তিল করে তিলোত্তমা রূপে গড়েছেন। ইচ্ছে হয় আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপে দেখি।'

পদ্মিনী বলল, 'আপনাকেও খুব সুন্দর দেখতে। শিব ঠাকুরের মতো।'

'আপনার ভাল লেগেছে আমাকে ?'

সম্মতি জানাল পদ্মিনী।

'তাহলে? বাধা কিসের? ধর্ম?'

'হঁ্যা।'

'আপনি সে বাধা ভাঙতে পারবেন, না আমাকেই হিন্দু হতে হবে?'

'আপনি আর কি করে হিন্দু হবেন?'

'টিকি রাখব পুজো করব। খড়ম পায়ে দেবো। নামাবলী গায়ে দিয়ে পৈতা ধারণ করব। তুমি আমার নাম রাখবে ফাল্গুনি ব্যানার্জি'।

হি হি করে হাসতে লাগল পদ্মিনী। তাকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলেন ফালমন সাহেব। হঠাৎ কিছুদূর থেকে তার বাবার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল পদ্মিনী। তারপর দৌড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ বাবাকে জড়িয়ে ধরল। পায়ের ওপর পড়ল। বলল, 'বাবা! আমিই অপরাধী, সাহেব নন। আমাকে তুমি যা ইচ্ছে শাস্তি দাও।'

অম্বিকাচরণ দেখলেন ফালমন সাহেব অবাক চোখে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর একহাতে মরা পাখি।

অম্বিকাচরণ বুঝতে পারলেন সাহেবের ভাল মানুষ সেজে পায়ে ধরার কারণ। তিনি বললেন, 'চল্ তুই বাড়িতে। তোকে আমি আজ জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।'

'বাবা!' আর্তনাদ করে বসে পড়ল পদ্মিনী। তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকলেন অম্বিকাচরণ। শেষে মেয়ের চুল হাতে পাকিয়ে হিড়হিড় করে টানতে থাকলেন। 'হারামজাদী, মেরে তোকে টাঙিয়ে দোব আজ'…অম্বিকাচরণ যেন জ্ঞানশূন্য ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন।

পদ্মিনীর মাও ছুটে এলেন। পিছনে তাঁর আরো তিনটি আড়-ঘোমটা দেওয়া বউ। পদ্মিনীর মা চেঁচাতে লাগলেন, 'ওগো, কি হল—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে—ছেড়ে দাও…'

ফালমন সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, 'ছেড়ে দিন, প্লিজ! সাবালিকা কন্যার ওপর এভাবে পীড়ন করবেন না! সে লেখাপড়া জানে। তার নিজের পছন্দ আছে। আমি পদ্মিনীকে বিবাহ করতে চাই। ছেড়ে দিন, আমি পদ্মিনীকে নিয়ে যাব। তাকে চুম্বন করেছি। তার জাত গেছে। আমি গরু খাই।'

পদ্মিনীর হাত ধরে টেনে ছাড়িয়ে নিতে সে ফালমনের বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল।

অম্বিকাচরণ বললেন, 'কি বলব সাহেব, ইচ্ছে করছে লাঠির ঘায়ে দুজনেরই মাথা গুঁড়িয়ে দিই।'

ফালমন সাহেব এবার বন্দুক তুললেন ভয় দেখাবার জন্যে।

পদ্মিনীর মা ভানুমতী চেঁচাতে লাগলেন, 'ওগো পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো—মেয়ে জাহান্নামে যাক।'

অম্বিকাচরণ হঠাৎ বাড়ির দিকে ছুটলেন। তার তিন ছেলে তখন লাঠি নিয়ে পুকুর পাড়ে বেরিয়েছে। তাদের হাঁক দিলেন অম্বিকাচরণ।

হঠাৎ সাহেব গুলীর আওয়াজ করলেন—শূন্যে ওঁদের দিকে লক্ষ্য করেই। নীলাভ ধোঁয়া উড়ে গেল। গুলির আওয়াজ শুনে কেউ আর সাহস করে এগিয়ে এলো না।

ফালমন সাহেব পদ্মিনীর হাত ধরে টানতে টানতে দৌড়ে এসে ঘোড়ার পিঠে তাকে বন্দুকটা ধরতে দিয়ে লাফিয়ে নিজেও উঠে বসলেন। পিছনে বসে পদ্মিনী সাহেবকে জড়িয়ে ধরলে ঘোড়া ছুটালেন ফালমন। পথের ধুলো উড়ল।

নীলকুঠিতে আসার পর সাহেব নেমে পড়ে পদ্মিনীকে নামিয়ে নিলেন। পাইক বরকন্দাজদের তৈরি থাকতে হুকুম দিলেন।

পদ্মিনীকে হাত ধরে তুলে নিয়ে গেলেন দোতলার ওপরে। নিজের কামরায় এনে বললেন, 'এই ঘর তোমার পদ্মিনী। তোমাকে আমি জয় করে এনেছি। তুমি আমার পরাজয়ের কারণ হয়ো না—তাতে তোমার মান-ইজ্জৎ বাঁচবে এমন কুলে তুমি জন্মাও নি।'

পদ্মিনী তখনো কাঁপছিল।

ফালমন সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে শুনতে পেলেন দূরের পল্লীতে তখন হো হো শব্দ উঠছে। শত শত মানুষ কি এগিয়ে আসছে?

আসুক তারা। তালি বাজিয়ে পাইক বরকন্দাজদের ছ জনকে দোতলায় উঠে আসতে ইংগিত করলেন। তারা উঠে এলে বারান্দার ছ-জায়গায় বন্দুক তাক্ করে বসিয়ে দিলেন।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউই এলো না।

রাত্রে কি ওরা মশাল জেলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

সাহেব ঠিক করলেন, 'তাই যদি হয় তবে একটা একটা করে গুলী করে সবাইকে সাবাড় করে দিয়ে নীলকুঠিতে আগুন লাগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পদ্মিনীকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন।

কিন্তু রাত পার হয়ে গেল। কেউ এলো না। ভোর রাতে বাড়ুজ্যে বাড়ি থেকে মেয়েদের কান্নার মিলিত স্বর শোনা গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার পর কপালে করাঘাত হেনে পদ্মিনী বলল, 'হায় আমার কপাল!'

'কি হয়েছে ভাবছ?'

পদ্মিনী কিছু না বলে মাথা নিচু করে শুধু শরীর ঝাঁকিয়ে কাঁদতে লাগল।

সকালে সংবাদ এলো অম্বিকাচরণ একেবারে একভরি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পদ্মিনী অনুশোচনায় ভেঙে পড়ল, তার জন্য তার বাবার মৃত্যু ঘটল। এমন জীবনে ধিক।

[১৪]

শের আলী পরদিন কলকাতা থেকে ফেরার পর কাউকে কিছু না জানিয়ে টাকার থলি নিয়ে ওপরে উঠে এসে পর্দা ঝোলানো দোরের পাশে দাঁড়িয়ে ফালসন সাহেবকে বলতে শুনল, 'ডার্লিং, প্রিয়তমা! তুমি আমার স্বপ্নের দেবী। আমার ভালবাসার সোনার খনি। হীরের জাহাজ। আমার ভুবন আলো করে তুমি জলো। মনের মধ্যে কোথাও অন্ধকার রেখো না। দুঃখ রেখো না। তোমার চোখে জল দেখলে আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়। দৈব ঘটনায় যেন তোমাকে আমি লাভ করলাম। এটা আমার বহুৎ ভাগ্য। তবে দুর্বিপাক যা ঘটল তা একেবারেই অভাবনীয়। তুমি কি আমার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছ ডার্লিং?'

'না। তোমার কোনো দোষ নাই। সবই আমার অদৃষ্ট!'

শের আলী অবাক। পদ্মিনী কেমন করে ফালসন সাহেবের ঘরে এলো?

চুপি চুপি সে নিচে নেমে আসতে গেল লোকজনের কাছ থেকে দৈব ঘটনাটা কি জানবার জন্যে। ফিল্টার করার পর ছাঁচে জমানো নীল প্যাকেটের মধ্যে ঢোকাচ্ছিল জনার্দন রায়। তাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার জনা, সাহেব বউ করে আনলেন নাকি!'

'হুঁ!' বলল জনার্দন।

'কেমন করে? অম্বিকা বাঁড়ুজ্যের মেয়ে মনে হচ্ছে।'

'হুঁ।' আবার বলল জনার্দন।

'কি তুমি হুঁ হুঁ করছ, কেমন করে এলো তাই বলো।'

'জানিনা। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে করে এনে নামিয়ে ওপরে তুলে নিয়ে গেল। আমাদের বললে লড়াইয়ের জন্যে অস্তর বাগিয়ে বসে থাকো। সারারাত পাহারা চলল। ডবল ডিউটি আমাদের।'

'ধুত্তোর ডিউটির কাঁথায় আগুন। সাহেব কি পদ্মিনীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন?'

'কন্যাদায় থেকে অম্বিকা বাঁড়ুজ্যেকে উদ্ধার করেছেন সাহেব। তার আনন্দে বাবাঠাকুর অফিম গিলে স্বর্গযাত্রা করেছেন।'

শের আলী টাকার থলেটা জনার্দনের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'যা, সাহেবকে দিয়ে আয়।'

জনার্দন ওপরে গিয়ে গলা খাঁকারি দিতে সাহেব হাঁক মারলেন, 'কোন্ হ্যায়?'

জনার্দন এসে সালাম বাজিয়ে টাকার থলিটা দিয়ে গেল।

সাহেব বললেন, 'শের আলী কোথা?'

'নিচে বসে আছে।'

'ডেকে দাও।'

জনার্দন চলে যাবার পর শের আলী এসে বলল, 'মে আই কাম ইন স্যার?'

'ইয়া। চলে এসো। দেখো, শেষ পর্যন্ত লুসি আমারই হল!'

'আপনি ভাগ্যবান।'

পদ্মিনী শের আলীর দিকে তাকিয়ে লজ্জানত চোখে মৃদু একটু হাসল।

'দুর্ভাগা তুমিই। যখন ওঁকে আনলাম তখন আমি সম্পূর্ণই একা। ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়ল। নদীর জল ছিটকালো। অপমানে দুঃখে ওর বাবা আত্মহত্যা করলেন। আমি এখন ওঁকে কেমন করে সান্ত্বনা দিই বলো তো?'

'অম্বিকাবাবুর আত্মা যাতে শান্তি পান তার জন্য আপনি চার বোতল সোনালী হুইস্কি আর একটা বাদামী ভেড়া উৎসর্গ করুন স্বর্গের দেবতা জুপিটারের উদ্দেশে।'

সাহেব খুশী হয়ে বললেন, 'তা আমি অবশ্যই করব—তোমরাও খুশী হয়ে খেয়ো।'

'বামুনের মেয়ে হয়ে আপনার মনে এই ছিল!'

পদ্মিনীর দিকে তাকিয়ে বলল শেরআলী। তারপর নিচে নেমে আসার সময় সাহেবকে শুনিয়ে বলল, 'আপনাদের দাম্পত্য সুখ গভীর আনন্দের হোক—আজ আমি বিদায় নিলাম স্যার।'

কয়েকদিন আর শের আলী নীলকুঠির অফিসের কাজে এলো না। ভাই বদরকে দিয়ে খবর পাঠাল তাকেও ম্যালেরিয়া ধরেছে। কাঁপ দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর হচ্ছে। লেপকম্বল মুড়ি দিয়ে চেপে ধরে বসে আছে মা আর ঠাকুরমা। ফালমন সাহেব শুনে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। পাঁচখানা গ্রামের পঁচিশটা বড় বড় পুকুরে নীলগাছ পচানোর ফলে দূষিত জলে প্রচণ্ড মশা জন্মেছে। বেলা একটু পড়লেই পঙ্গপালের মতো মশার ঝাঁক মানুষের মাথার ওপরে ভোঁ ভোঁ শব্দে গান গেয়ে গেয়ে রক্তের লোভে উড়তে থাকে। ঘরে বসা যায় না। রাত্রে গা-হাত ফুলিয়ে দেয়। নীলকুঠির কাজ করা বারোজন লোক জ্বরে পড়ে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে গেছে। নতুনলোক আমদানি করতে না পারলে কাজকাম বন্ধ হয়ে যায়। গত রাত্রে যারা বন্দুক ধরে মশার কামড়ে ডিউটি দিয়েছিল তারাও সকালের দিকে পালিয়ে গেছে। সাহেবের ভাবনা হল, তাঁকেও যদি ম্যালেরিয়া ধরে?

ফাল্‌মন সাহেব গম্ভীর মেজাজে বারান্দায় পায়চারি করার পর ঘরে এসে হাতে হাত ঘষে বললেন, 'কি করা যায়?'

পদ্মিনী বলল, 'কিসের কি করা যায়?'

'মশা, ম্যালেরিয়া! কাজকাম বন্ধ হয়ে যাবে?'

পদ্মিনী বলল, 'সত্যি বড় মশা! সন্ধ্যা না নামতেই মশার জ্বালায় টেকা মুশকিল। গরুর গোয়ালে মশা তাড়াতে ধোঁয়া দিত, এখন ঘরেও ধোঁয়া দেয়। কতলোকের খড়-তালপাতা, নারকেল-গোলপাতা। উলুর কুঁড়েঘর পুড়ে যায়। একটু অবস্থাপন্ন লোকরা তবু মশারী ব্যবহার করে, সাধারণ গরিব মানুষের পেটের অন্ন যোগার করতেই অস্থির। মশারী জুটবে কেমন করে?'

'—তাই তো! একটা কাজ করবে পদ্মিনী?'

'বলো।'

'নীলকুঠির কাজ বন্ধ করে দিয়ে যদি রেলওয়ে অফিসার হই, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'তুমি যেখানে যাবে, তোমার ছায়ার মতো আমাকেও যেতে হবে '

বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে ফালমন বললেন, 'কাল আমি একবার কলকাতায় যাব, রেল দপ্তরের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করব আর···ঠিক আছে, তুমিও সঙ্গে চলো—গীর্জায় আমাদের বিয়ে হবে। তবে আমার ভাইকেও বলা দরকার।'

'ভাই যদি অমত করে, আমি নেটিভ মেয়ে।'

'তাহলে বৈষম্য সুনিশ্চিত। ব্যবসার টাকা ভাগা-ভাগি করে নেবো।'

ফালমন বড় ভালবাসেন পদ্মিনীকে। সারা সময় তার সঙ্গে রগড় আমোদ-স্ফূর্তি, খুনসুটি করেন। কিন্তু রাত্রে উনি মদ খেয়ে মাতলামিও করেন বিস্তর।

পরদিন সাহেব কলকাতায় গেলেন সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে। মাথায় উঁচু টুপি। কোমরে পিস্তল। চামড়ার ওভার কোট গায়ে। যাবার সময় বললেন, 'আমার যেন মাথা ঘুরছে। গায়ে সামান্য সামান্য জ্বর ভাব। তুমি সাবধানে থেকো পদ্মিনী। এখন একা যাই তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ভায়ের কি মত জেনে দেখি। যদি মত থাকে, তাকে আর একজন পাদ্রী-বাবাকে এখানে এনে খ্রীস্টান মতে আমাদের বিয়ে হবে। পাইক বরকন্দাজরা পালিয়ে গেছে, জ্বরেও ভুগছিল ক'জন। বাকিরা ভয় পেয়ে তাদের সঙ্গে ভেগেছে। ছ-খানা বন্দুক অছে লুট না হয়ে যায়। নবাবজান আর জনার্দন রইল, ওরা যাবে না মনে হয়। তবে বাবুর্চি গোলাম সেখ আর আসবে বলে মনে হয় না। তুমি নিজের হাতে রেঁধে খেয়ো।'

'তাই হবে। এই অসুস্থ অবস্থায় আজ না গেলেই পারতে।' হেসে বিদায় দিল পদ্মিনী।

ফাল্‌মান সাহেব নিচু হয়ে বাঁ হাতে চুমু দিয়ে রুমাল উড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু সাতদিন পরেও তিনি আর ফিরে এলেন না।

কী ব্যাপার ভেবে পায় না পদ্মিনী। কাজের লোক আর জমির মালিকরা বাৎসরিক পাওনা-কড়ির জন্য এসে বসে থাকার পর চলে যায়। পাইক বরকন্দাজদের ছেলেরা আসে বাকি মাইনের তাগাদায়। কেবল নবাবজান আর জনার্দন কাজ নিয়ে টিকে থাকে নীলকুঠিতে।

পদ্মিনী একদিন সকালে নবাবজানকে বলল, 'তুমি একবার যাওতো

নবাবজান, শের আলীর বাড়িতে। তাকে ডেকে আনবে, বলবে, পদ্মিনী ডেকেছে। সেই কলকাতার ঠিকানা জানে।'

নবাবজান হাত বাড়াল মাথা গুঁজে। অর্থাৎ তার জন্যে নজরানা চায়।

একটা টাকা দিতে নবাবজান চলে গেল। আটদিন হল বাবুর্চি গোলাম সেখ গেছে আর ফেরেনি। রান্না করে খেতে হয় পদ্মিনীকে। খরচার টাকাও ফুরিয়ে গেছে প্রায়। আয়রণ চেস্টের চাবি সাহেব নিয়ে গেছেন। তার মধ্যে টাকা আছে কিনা তিনিই জানেন। কাজকাম সব বন্ধ।

পদ্মিনীর ডানচোখ নাচছে ক্রমাগত। ছাদের আলসেয় বসে কাক ডাকছে।

যদি কিছু ঘটে থাকে? রাত্রে ফেরার পথে সাহেবকে কি কেউ মেরে দিল? লাস গাপ্ করে ফেলেছে? কলকাতায় গিয়ে জ্বর হয়েছে? ম্যালেরিয়ায় বিকার গ্রস্ত? নাকি ভাইয়ের সঙ্গে কলহ করে তাকে ফেলেই ব্যবসা ছেড়ে দেশে চলে গেছেন? গেলে এতদিন কোন সমুদ্রে পেঁীছেছেন?

তাহলে তার কি হবে?

বাপের বাড়িতে গিয়ে আর উঠতে পারবে না। মামার বাড়িতেও না। তিনকূলে কোথাও আর তার ঠাঁই নেই।

আবার আর একমন বলে, 'না, সাহেব ফিরে আসবেনই। তিনি যে তাকে পাগলের মতো ভালবাসেন!'

সাহেবের নীল চোখ দুটো মনে পড়ে।

তারপর বাপের কথা মনে পড়তে তার দু-গাল বেয়ে চোখের জল নামে। হাঁড়ির গা বেয়ে ফেন গড়িয়ে উনুন নিভে যায়।

দুপুরবেলা এলো শের আলী। পদ্মিনী তার চেহারায় জ্বরে ভোগার কোনো রকম লক্ষণ দেখতে পেল না। বলল, 'আপনি যে আর আসছেনই না! বসুন, কথা আছে।'

সাহেবের ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসল শের আলী। বলল, 'আমার বাবা মৌলবী সাহেব, তিনি আদৌ পসন্দ করতেন না যে আমি খ্রীস্টান ইংরেজ সাহেবের কাছে চাকরি করি আর নীলচাষের কাজে অনিচ্ছুক লোকদের বাধ্য করি। এইকাজে আমার বদনাম হয়েছে। সাহেবের পাল্লায় পড়ে মদ খাওয়া অভ্যাস করে ফেলেছিলাম বলে শুধু বাবা নন, সমস্ত মুসলমানই আমার ওপরে রেগে। এসব করলে বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শপথ করেছেন।

এখন কি করব বলুন। সাহেব এলে বলবেন, আমার ওপরে যেন রাগ না করেন।'

'আপনি তাহলে ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ার কথা বানিয়ে বলেছিলেন ?'

'কি আর বলব বলুন। যাক, আপনি এখানে কেমন আছেন ?

মাথা নিচু করে বসে রইল পদ্মিনী।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শেরআলী বলল, 'বলুন, এখন আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন।'

পদ্মিনী বলল, 'সাতদিন হয়ে গেল সাহেব কলকাতাতায় গেছেন, কোনো খোঁজ খবর পাচ্ছি না। আপনি একবার যাবেন দয়া করে ?'

সের আলী পদ্মিনীর আকুতিভরা মুখচোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'যাব। আপনার জন্যে আমি সব কিছুই করতে পারি। তবে একটা শর্ত রইল, আল্লাহ্ না করুন, যদি কোনো রকম দুঃসংবাদ পান, ধৈর্য ধরবেন। সম্মান হারিয়ে পা তুলে কোথাও যাবার আগে এই অধমকে মনে রাখবেন। আমি এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'টাকাপয়সা আপনার কিছু লাগবে ?'

'না। পঞ্চশত বিঘে জমি আর পাকাবাড়ি আছে আমাদের। সাহেবের নুনও খেয়েছি অনেক। এখন তাঁর, বিশেষ করে এই সময়ে আপনার কাছে হাত পাতা! আচ্ছা, আমি আসছি।'

শের আলী নেমে গেল সিঁড়ি ভেঙে। নিচে নেমে সে ওপরের দিকে একবার তাকাল। পদ্মিনী হাত নেড়ে হাসল।

সময় যেন আর কাটতে চায় না।

রাত্রে ঝড় ওঠে। আকাশ গোঁ গোঁ করে। একা পদ্মিনী জানালা দোর বন্ধ করে বিছানায় পড়ে থাকে।

মশা তাড়ানোর জন্যে এক সময় জানালাগুলো খুলে দেয়। ঝড় ভেতরে ঢুকে পোষাক-আষাক ঝাপটা মেরে উড়িয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

জানালা এঁটে দিয়ে আবার আলো জ্বালে পদ্মিনী।

মেঘের গর্জন হয়। বৃষ্টি নামে মুষল ধারায়।

মাঝরাতেও সে বৃষ্টি থামে না।

হঠাৎ দোরের ওপরে করাঘাত পড়ে।

'পদ্মিনী, 'আমি শের আলী। দোর খুলুন। পদ্মিনী—'

দোর খুলল পদ্মিনী। বলল, 'ইস! আপনি ভিজেভিজেই এত রাতে এসেছেন?'

জামাকাপড় না খুলেই শের আলী বলল, 'সন্ধ্যার পর যখন কলকাতা থেকে রওনা হই ঝড় ওঠে। পথে ঝড় ঠেলে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে বৃষ্টি নামল। উহ্, কী বৃষ্টি!'

'আসুন, ভেতরে আসুন। কাপড় ছেড়ে গা-হাত মুছে ফেলুন। খবর ভাল তো?'

'বল্ছি।' বলে শের আলী ভেতরে ঢুকে জামা খুলল। গা-মাথা মুছল। তোয়ালে পরে প্যান্টও ছেড়ে ফেলল। বলল, 'ফাল্গুন মাসেও ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে। পাঁচ-ছ ঘণ্টা প্রায় একটানা ভিজেছি। আর বাড়ি গিয়ে স্থির থাকতেও পারতাম না সকালে আসার অপেক্ষায়।'

'কেন, সংবাদ কি ভাল নয় শের আলী সাহেব?'

'না।'

'কি হয়েছে'

'সাহেবের খুব জ্বর হয়েছিল ওখানে গিয়ে।'

'তারপর?'

'তিনদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। ইংরেজ ডাক্তার দেখছিলেন। জ্ঞান হবার পর ভুল বকছিলেন। তারপর চতুর্থ দিনেই প্রচণ্ড জ্বর ওঠার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

পদ্মিনী মাথায় চাপড় মেরে কেঁদে ওঠে, 'হায় আমার কী হবে গো! আমি এখন কোন কূলে দাঁড়াব? হায় আমার মতো হতভাগিনী আর কে আছে গো—'

সাহেবের একটা প্যান্ট পরলো শের আলী। জামাও বদলালো। ভিজে প্যান্টের পকেট থেকে চাবির গোছাটা বার করে এনে আয়রন চেস্ট খুলল।

একেবারেই ফাঁকা! বলল, 'ওঁর ভাই গ্যারিসন বলেছেন, এই চাবি নিয়ে গিয়ে লোহার সিন্দুক খুলে যা টাকাকড়ি পাবেন পাওনাদারদের দেবেন। নীলকুঠির বাড়ি ছেড়ে দেবেন। এখন দেখছি সিন্দুকে একটা কানাকড়িও নেই।'

পদ্মিনী কাঁদতেই থাকল।

বাইরে তখনো ঝড়ো হাওয়া বইছে আর ঝির ঝির করে বৃষ্টি ঝরে চলেছে। ঘোড়াটা হঠাৎ ডেকে উঠল।

শের আলী বেশ কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে ভাবতে লাগল। তারপর নিচে নেমে গেল নবাবজান আর জনার্দনকে দুঃসংবাদটা দেবার জন্যে।

তারা শোনার পর চুপচাপ বসে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নবাবজান বলল, 'নতুন বউয়ের কি হবে?'

জনার্দন খ্যাক করে উঠল। বিড় বিড় করে বলল, 'বিয়ে হলে তো বউ—তাঁর আবার দায় কিসের? ভাইটাও তো আসতে পারতেন। বন্দুক, মেশিনপাট নৌকো, সাজপোযাক, আসবাবপত্র এসব কে নেবে?'

নবাবজান বলল, 'টাটকা মানুষ গেল আর ফিরল না। আসলে শালা সাহেবটা মদ খেয়ে খেয়ে বোধকরি ন্যাবা রোগে জ্বর উঠেই মারা গেল। সাহেবের জিনিসপত্র আর ঐ নতুন মেমদিদিমণি এখন সব কিছুই শের আলী সাহেব তোমার হেপাজতেই থাকুক। সাহেবের ভাই কি মেম দিদিমণির কথা জানে?'

শের আলী বলল, 'সবই বলেছি তাঁকে। তিনি বিয়ে হয়নি বলে বৌদিদির সম্মান দিয়ে বিলেতে নিয়ে যেতে নারাজ। তাঁরও নাকি অবস্থা ভাল নয়—যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলেন সে ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলে দিয়েছে। বন্দুকগুলো এখন থানায় জমা দিতে হবে। সাহেবের ভাই বলেছেন, পাঁচহাজার টাকা যদি দেনা হয় তবে আমার পক্ষে তা শোধ করা সম্ভব নয়। ঘোষণা করে দাও, কোম্পানী ফেল হয়ে গেছে। আর আয়রণচেস্টের চাবি সাহেবের কাছ থেকে পেয়ে সেটা দিয়েছিলেন—যদি কিছু টাকা থাকে কর্মচারীদের বাকি মাইনে দিতে কিন্তু পদ্মিনীর সামনে এখন খুলে দেখলাম সবই ফাঁকা! এখন বন্দুকগুলো কেউ নিয়ে না পালায়।'

জনার্দন বলে উঠল, 'শালা, সাহেব তাহলে বিষ খেয়েছে!'

'তাই কি!' শের আলীর কথাটায় যেন সন্দেহ হল।

নবাবজান বলল, 'হতেও পারে। সাহেব যাবার পর টাকা চাইতে ভাই যখন বলেছে ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলেছে তখন আর কি করার আছে?'

জনার্দন আবার এক তত্ত্ব বার করে বলল, আসলে ব্যাঙ্ক ফেলটেল কিছু নয়। ঐ ধার্মিক ভাইটাই সব টাকা সটকে দিয়ে এখন বোধহয় বিলেতে চলে যাচ্ছে। ফালমন সাহেবের জন্ম দিনে ভাই এসেছিল কই, সাহেব হয়েও এক-গেলাস মদ পর্যন্ত খেয়েছিল কি? কুটকুটে চোখে তাকিয়ে সারাক্ষণ চুপচাপ

বসেছিল। মুখে হাসি মনে প্যাঁচ। নতুন বউ করে ব্যবসার হাল খারাপ দেখে ফাল্‌মন সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে যায়—তাই অঘটন ঘটিয়েছে বোধহয়।'

শের আলী বলল, যাহোক, আমাদের এখন বিশ্বাস করতে হবে ফালমান সাহেব আকস্মিক জ্বর উঠে মারা গেছেন। এখন কোম্পানী বন্ধ। এ বাড়িও ছাড়তে হবে আমাদের সবাইকে। জিনিসপত্র থানায় জানিয়ে আমার জিম্মায় থাকবে।'

জনার্দন বলল, 'আর মেমদিদিমনি কি ওর বাপের বাড়ি গিয়ে উঠলে জায়গা পাবে?'

নবাবজান বলল, 'তোর শালা মাথায় একেবারে গোবর আছে। যে মেয়ের জন্য বাপ আত্মহত্যা করে মরল তাকে ভাইরা আর ঠাঁই দেয়?'

জনার্দন বলল, 'যার ভাবনা সেই করুক—বাকি রাতটা ঘুম নষ্ট করে লাভ নেই—কাল সকালে বাড়ি চলে যাব।'

শের আলী চলে আসার সময় নবাবজান পিছু নিল। সিঁড়ির মুখে এসে সে বলল, 'আমার মাইনেটা দিও ভাই, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। এই বুড়ো বেলায় কোথা যাব, কি করব, এককাঠা জমি-জায়গা নেই মোর।'

শের আলী বলল, 'কাল থেকে তুমি আমার বাড়ির কাজ করবে—মাসে পঞ্চাশ টাকা পাবে। গোরুর গাড়ি এনে সাহেবের মালপত্র নিয়ে যাবে আমার বাড়ি। জনার্দন চলে যাবে, ওকে আর কিছু বলো না। লোকজন টাকাকড়ি চাইতে এলে বলবে সাহেব মারা গেছে কে দেবে? জিনিসপত্রের দখল চাইলে বলবে থানায় সব জমা পড়ে গেছে। একটা বন্দুক রাখব, বাকি পাঁচটা অবশ্য থানা নিয়ে নেবেই। যে বন্দুকটা নেবো তার লাইসেন্স পাবার চেষ্টা চালাব। ভোরেই জিনিসপত্র সব নিয়ে যাবে।'

ঠিক আছে। তবে, আর একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'পদ্মিনী দিদিমনিকে তুমি সাদি করে লও। কোথায় যাবে আর অমন সোনার চাঁদ মেয়েটা? খারাপ হয়ে যাওয়া ছাড়া ওর আর এখন বাঁচবার রাস্তা কোথা?'

'ভাবছি আমি নবাবজান! তাই করব বোধহয়, তবে পদ্মিনী যদি রাজি হয়।'

শের আলী উঠে এসে দোর খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল তেমনি বিছানায় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে পদ্মিনী। মাথায় হাত বুলোতে থাকল সে পাশে বসে। রেশম কোমল দীর্ঘ চুল পদ্মিনীর। সরু কোমর আর গুরু নিতম্ব। পাকা ফর্সা রঙ। নাক চোখ অপূর্ব সুন্দর। ফালমন সাহেবের 'লুসি'। লাখের মধ্যে এক। বাছাই করা সেরা মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি চেহারা।

শের আলী যখন শোনে সাহেব তাকে লুটে এনেছেন তখনি তার মন বিগড়ে যায়। পদ্মিনীকে দেখার পর তাকে পাবার আশা জাগে মনে। কিন্তু কোন পথে কিভাবে পাবে কোনো রকম কূল-কিনারা দেখতে পায়নি। ভেবেছিল ফালমন যদি তার ওপরে নির্ভর করে ওর দিকে এগোতে যেতেন তাহলে সে গণ্ডগোল পাকাত। সাহেব ছিলেন ধূর্ত। টের পেয়ে একাই অম্বিকাচরণের শরণাগত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন পদ্মিনীকে অধিকার করে আনলেনই তখন জ্বর হবার অজুহাত দেখিয়ে শের আলী আর নীলকুঠিতে না এলেও সাহেবের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকিয়ে তোলার ভাবনা ভাবছিল! সাহেবকে এখান থেকে দৌড় ছাড়াবার জন্যে শত খানেক লোক জুটিয়ে নিয়ে একরাত্রে ডাকাত পড়ার মতো একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবার পরিকল্পনাও সে করেছিল। পুকুর আর জমির মালিকরা ছাড়া নির্যাতিত শ্রমিকরাও তার এই বিদ্রোহে সামিল হতো নিশ্চয়। কিন্তু ঘটনাটি ঘটানো ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহেবের গুলিতে ঘায়েল হয়ে প্রাণ যেতেও পারত। আর সাহেব পালালেও পদ্মিনীকে পাওয়া যেত কিনা তারও কোনো রকম ঠিক ছিল না। তাকে নিয়েও তো ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে পারতেন। আর সাহেবকে মেরে ফেললে লাল পাগড়ি পুলিসে গোটা একাকায় আর কারো বাড়িতে সাঁজবাতি জ্বালতে দিত না। কিন্তু ঘটে গেল অন্য রকম আর এক আশ্চর্য ফলপ্রসূ কাণ্ড! শের আলী মনে মনে বুকবুক খুশী। কিন্তু তা জানতে দিতে চায় না পদ্মিনীকে।

'পদ্মিনী!' পিঠে হাত রেখে বিহ্বল কণ্ঠে ডাকল শের আলী, বলল, 'কেঁদে আর কি হবে?'

পদ্মিনী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি পাপীয়সী। আমাকে ছোঁবেন না। নইলে আমার বাবা গেলেন, স্বামীও গেলেন!'

'এসব দৈবাৎ ঘটনা। তার জন্যে তোমার আর দোষ কি?'

'আমার কপাল খারাপ না হলে এমন হবে কেন?'

'জানি না, সাহেব বেঁচে থাকলে সংসার জীবনে তুমি সুখী হতে কিনা।

কাল মনের ভেতরে প্রেম-ভালবাসা, মানবতাবোধ থাকলেও মদ খেলে রাত্রে তিনি পশুর মতো হয়ে যেতেন। সে সব অশালীন বিবরণ এখন আর আমি দেবো না, তিনি মারা গেছেন, তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক।'

পদ্মিনী এবার উঠে বসল। আলু থালু বেশ। দুঃখ আলতায় ধোয়া বুকের ওপরটা দেখা যাচ্ছে। আঁচলে চোখ-মুখ মুছে রুদ্ধ স্বরে বলল, 'তোমার কথা সত্যি শের আলী। সাহেব রাত্রে মদ খেয়ে পশু হয়েই যেতেন। শেষরাত্রে আমার হাতে কি রকম কামড় বসিয়েছিলেন—এই দেখ!'

বাঁ-হাতটা তুলে দেখাল পদ্মিনী। তখনো লাল হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আমি এখন বাড়ি যাই?'

পদ্মিনী যেন ভয় পেল। বলল, 'না, তুমি আমাকে এই ঘরে একা ফেলে রেখে যেও না শের আলী। বাবা আর স্বামীর প্রেতাত্মা আমার ওপরে অত্যাচার করতে আসবে।'

এসব মনের ভুল। আমি যাই—বড় খিদে লেগেছে। সেই সকালে দুধ-মুড়ি-কলা খেয়ে বেরিয়েছিলাম।'

পদ্মিনী উঠে পড়ে আলমারী খুলল। বিস্কুট ভরা একটা ডিবে এনে বসিয়ে দিলে। জল গড়িয়ে দিলে এক পাত্র।

খেতে থাকল শের আলী। বলল, 'এরপর তুমি কোথায় থাকবে পদ্মিনী?'

'জানি না।' হাঁটুতে গাল রেখে বলল পদ্মিনী।

'যদি আমি তোমাকে নিয়ে যাই, যাবে?'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'তোমার বাবা মৌলবী মানুষ, থাকতে দেবেন?'

'মা আছেন। আর আছেন ঠাকুরমা—তিনি ছিলেন তোমার মতেই ব্রাহ্মণ বাড়ির বিধবা। তাঁদের কাছে থাকবে।'

'কি শর্তে?'

'এখন অবশ্য আশ্রিতা, পরে একটা দায়িত্ব এসে যাবেই।'

'লোকের নিন্দা তোমার বাবা সইবেন কেন?'

'লোকনিন্দা অবশ্যই হবে। কিন্তু বাবা অমত হবেন বলে মনে হয় না। তবে সমস্যাও আছে।'

পদ্মিনী বলল, 'আমি কাল মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করব, ভাবছি।'

'বাড়িতে গিয়ে ?'

'না। বাইরে কোথাও ডেকে পাঠাব।'

'দুই বিধবা এক জায়গায় হবেন ?'

পদ্মিনী কিছুই বলল না, শুধু ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইল।

শের আলী উঠে পড়ল। বলল, 'একঘরে থাকা উচিত হবে না। জনার্দন আর নবাবজান জানে, ভাববে আমিও মন্দ চরিত্র। আজ আমি যাই। তুমি দোর এঁটে শুয়ে থাকো। ভোরেই আমি এসে পড়ব। জিনিসপত্র সব আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব, নইলে পাওনাদাররা নিয়ে নেবে। একটা বন্দুক নিয়ে যাই। বন্দুক নিয়ে পালালে তোমাকে থানার দারোগার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই দু-নলা বন্দুকটা পাবার জন্যে আমি চেষ্টা চালাব। আচ্ছা পদ্মিনী, আমার জানা বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তোমার কি মা হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ?'

পদ্মিনী লজ্জাকাতর চোখে তাকিয়ে বলল, 'না।'

শের আলী বলল, 'ঠিক আছে, তবুও আমি ডাক্তার দেখিয়ে তার মতামত নেবো আর আব্বাকে তা দেখাব। তখনো যদি বলেন শরিয়ক মোতাবেন তিন মাস দশ দিন অপেক্ষা করতেই হবে তাহলে মতান্তর বাধবে।'

'তাহলে আমাকে কোথায় রাখবে ?'

'তাহলে এই ঘরেই তুমি থাকবে, আমি বাড়ির মালিক সুশান্ত গাঙ্গুলীর কাছ থেকে ভাড়ায় নেবো।'

'একাই থাকব ?'

'না, আমার ঠাকুরমাকে তোমার কাছে রাখব, আর আমিও রোজ আসব।'

বন্দুক হাতে নিয়ে নেমে গেল শের আলী।

আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। বৃষ্টি ধোয়া গাছপালার পাতা হাওয়ায় দুলে চকচক করছে।

শের আলী ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল।

কন্যা কুমারী নদীর জলে চাঁদ খেলা করে। বারান্দা থেকে ভেতরে এসে দোর জানালা বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে পদ্মিনী। ফালমন সাহেব যেন এখন স্বপ্নের জগতের মানুষ।

শের আলী তাকে বিয়ে করে সাংসারিক মর্যাদাই দিতে চায়। হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের রক্ত তার শরীরে তাই তাকে দেখতেও বেশ সুন্দর। সাতাশ

আটাশ বছরের যুবক। লাঠির মতো চেহারা। রং বেশ ফরসা। বাঁশির মতো টানা খাড়া নাক। আয়ত চোখ। সুন্দর দাঁতের সারি। বেশ উঁচু চেহারাও। কিন্তু তবু ওরা মুসলমানই। হিন্দুর মেয়ে সে, ঠাকুর দেবতার পুজো করেছে চিরকাল। ফালমন ছিলেন খ্রীস্টান, একেশ্বরবাদী হলেও তাঁর ঘরে ছিল যীশুর মূর্তি আর ছবি কিন্তু শের আলীরা একেবারে উল্টো! প্রতীক বিরোধী।

ফালমন তো মারাই গেছেন আর কোনোদিনই তিনি আসবেন না কিন্তু তার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব তাহলে এখন কে নেবে? হিন্দুর কুলে জন্মেছে, বিয়ের পর তার আর পৈতৃক বিষয়ের অধিকার কিসের? তাছাড়া ধর্মত্যাগ তো মৃত্যুর সমান। মায়ের সঙ্গে দেখা করার পর তার জন্য দুঃখ করে চোখের জল ফেলা ছাড়া আর তিনি কিইবা করতে পারেন?

কিন্তু শের আলী তো ফালমনের বেতনভুক্ কর্মচারী—সে এখন তার সব কিছু দখল করে বসবে? মায় তাকে পর্যন্ত! ফালমনের ভাইটাও এলেন না?

নাকি ফালমন একদিন আসবেন, তাঁর মৃত্যু-সংবাদ মিথ্যা?

শের আলীর লোভ জন্মেছে তাকে পাওয়ার—তার চোখে-মুখে-ব্যবহারের কথায় যেন তা প্রকাশ পাচ্ছে? তাকে নীলকুঠিতে আনার পর অসুস্থতার অজুহাতে বেশ কয়েকদিন আসে নি সে। কারণ অবশ্যই সাহেবের ওপরে রাগ।...

কুল-কিনারাহীন এইসব অনেক কিছু ভাবনা-চিন্তার পর ভোরের দিকে বোধ-একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল পদ্মিনী। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল তার ঘোড়ার হ্রেস্বা ধ্বনিতে। ফালমন কি তাহলে ফিরে এলেন?

পিছনের জানালা খুলে দেখল, বাইরে তখনো পাৎলা অন্ধকার ঝুলে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে মানুষ উঠে আসার শব্দ। ফালমনের বুটের শব্দই তো! বন্দুক লুটের ভয়ে তবুও সে দোর খুলল না।

দোরের কড়া নাড়ার শব্দ হল।

সামনের জানালাটা খুলে পদ্মিনী দেখল শের আলী। সাহেবের বুট পায়ে! কখন নিল? তাহলে সাহেব মারাই গেছে। বন্দুকটা অবশ্য নিয়ে এসেছে। দোর খুলল পদ্মিনী।

শের আলী বলল, 'আমি গোরুর গাড়ি এনেছি। জিনিসপত্র তুলে দিয়ে চলো পদ্মিনী, আমাদের বাড়িতে।'

'আপনার বাবাকে বলেছেন?'

শের আলী ইতস্ততঃ করল। 'মা আর ঠাকুমাকে বলেছি। তোমাকে তারা দেখতে চায়। বাবা মায়ের কাছে সব শুনে চুপচাপ ছিলেন কোনো রকম বিরুদ্ধ মতামতও অবশ্য জানান নি।'

পদ্মিনী বলল, 'বসুন আপনি, আমাকে চিন্তা করতে দিন।'

বাথরুমে গেল পদ্মিনী।

নবাবজান আর জনার্দন উঠে এসেছিল মালপত্র নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। ড্রেসিং টেবিল আর কোচ ধরে যখন টানাটানি করছে তখন পদ্মিনী তাদের বলল, 'থাক ওসব। তোমরা নিচে যাও।'

নবাবজান আর জনার্দন মুখ-চাওয়া-চায়ি করতে লাগল।

শের আলী তাদের নেমে যাবার ইংগিত করল। পদ্মিনীকে বলল, 'আমিও নেমে যাই তাহলে?'

'হঁ্যা, বন্দুকটা রেখে যান।'

'আপনি এসব রক্ষা করতে পারবেন?'

'দেখছি, আমি তো বি-এ পাশ করেছি। থানার ঝামেলা আমি পোয়াব। আর কোনো স্কুলে চাকরি পাই কিনা দেখব। বাড়িওয়ালা সুশান্ত গাঙ্গুলীর কাছে আমি যাব—তিনি সম্পর্কে আমার মামা হন।'

'বেশ। সাহেবেব পোষাক আর জুতো আমি আজকেই পাঠিয়ে দেবো।'

'দয়া করে যদি কলকাতায় সাহেবের ভায়ের ঠিকানাটা দিয়ে যান ভাল হয়। আমি সাহেবের কবরে ফুল দিতে যাব।'

'কোম্পানীর নামের প্যাডেই আছে, ঠিকানাটা দেখে নেবেন। আর কর্মচারীদের বাকি মাইনেপত্রও চুকিয়ে দেবেন।'

'চেষ্টা করব, তবে এখনি নয়।' সশব্দে দোর বন্ধ করে দিলে পদ্মিনী। তারপর এসে বিছানায় বসে পড়ল। তার এখন একবার থানায় যাওয়া দরকার।

গোরুর গাড়ি ফিরে যাচ্ছিল—পিছনের বারান্দায় গিয়ে গাড়িওয়ালাকে ডাকল সে। বলল, 'এই গাড়িওয়ালা, দাঁড়িয়ে যাও, আমাকে একবার থানায় নিয়ে যাবে।'

কালো রঙের শাড়ি পরে মাথায় কালো রুমাল বেঁধে দোরে চাবি দিয়ে নেমে এসে নবাবজানকে খুঁজতে জনার্দন বলল, 'সে শের আলী সাহেবের সঙ্গে চলে গেছে। তাদের বাড়ি থেকে নাকি কাজকাম করবে। আমিও চলে যাচ্ছি দিদিভাই।'

'না। তুমি একদম যাবে না। নীলকুঠি ছেড়ে একপাও কোথাও যাবে না। তোমার দায়িত্বে সব রইল। আমি থানা থেকে ঘুরে আসছি।'

'একাই যাবেন ?'

'নবাব থাকলে যেত—সে তো আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলেই চলে গেল। ওরা আমার বিপদের বন্ধু হতে চায় !'

জনার্দন সরদার এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। কৈবর্তের ছেলে সে। আর শক্ত সমর্থ। বুকের পাটাখানাও চওড়া। কর্মঠ পেশীবহুল দু-খানা হাত। বলল, 'তুমি এখানেই থাকবে দিদিভাই ?'

'কোথায় আর যাব ?'

'হুঁ, শালা ! আমারও বাড়ি যাওয়া হয়ে গেল ! আচ্ছা এসো, দেখি শালা কে তোমার কি করতে পারে ! আমাকে একটা বন্দুক আর কয়েকটা টোঁটা বার করে দিয়ে যাও।'

স্মিত হেসে পদ্মিনী আবার ওপরে উঠে গেল। জনার্দন গিয়ে তার পছন্দ মতো বন্দুকটা তুলে নিয়ে বাক্স থেকে গোটা দশেক কার্তুজ নিল।

দোরে চাবি দিয়ে নেমে আসার পর পদ্মিনী বলল, 'আমার জন্যেও তুমি রেঁধে রেখো।'

'ঠিক আছে, 'নীলের পুকুরে একক্ষেপ জাল ফেললেই পোনা মাছ পেয়ে যাব। আমার রান্না তুমি খাবে ?'

'তুমি হিন্দু তো বটে, আমি ওসব মানি না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা।'

জনার্দন খুশী হয়ে বন্দুক তুলে হঠাৎ ফায়ার করে সজনে গাছের ডালে বসা মাছরাঙাকে ফেলে দিল।

পদ্মিনী এসে গোরুর গাড়িতে উঠল। সুন্দর করে বোনা টোংটার মধ্যে বসল। বাওয়ালী শালতি ঘাটায় আসার পর শালতিতে উঠতে হল।

যাত্রী বোঝাই ঝরঝরে একটা কালো কচ্ছপ মোটর চলে পাকা রাস্তা ধরে পোঁয়াক পোঁয়াক শব্দ তুলে কিন্তু কখন সে আসে যায় তার ঠিক নেই।

বজবজ থানায় আসার পর বড় দারোগার খোঁজ নিতে সবাই যেন সন্ত্রস্থ হয়ে উঠল। তার সম্ভ্রান্ত চেহারা আর রূপ যৌবন দেখে খাতির করে বসালেন মেজবাবু।

বড়বাবু মিঃ সান্যাল পদ্মিনীর সব কথা শোনার পর বললেন, 'ঠিক আছে,

আপনার কোনো ভয় নেই। নিরাপত্তার ভার আমরা নিলাম। মেজবাবু দুজন কনস্টবল নিয়ে আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন, বন্দুক নিয়ে আসবেন।'

'একখানা বন্দুক দয়া করে আমার এক্তিয়ারে রাখতে দেবেন?'

'রাখা তো উচিত, আপনার যে রকম অবস্থা তাতে বিপদ ঘটতেও পারে, যা শুনলাম। আচ্ছা, এখন সব পাঠিয়ে দিন, এস পি সাহেবকে আমি বলি— পরে ব্যবস্থা করে দেবো। তবে রিভালভারটা যদি ফালমন সাহেব নিয়ে যান, কোম্পানীর ঠিকানায় চিঠি দিয়ে খোঁজ নেবো। আর সাহেবের ভাই যদি সঙ্গে নিয়ে বিলেতে চলে যান তাহলে আর তা জমা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক আছে আসুন।'

তবুও চুপচাপ বসে রইল পদ্মিনী।

বাইরে দাঁড়িয়ে চটকলের অবালী কোন সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন —তারপর ফিরে এসে বড়বাবু বললেন, 'আর কিছু বলবেন?'

'একটা বন্দুক আমার কাছে এখন রাখুন। এস পি সাহেব যদি দিয়ে দিতে বলেন তখন নাহয় নেবেন।'

'দেখুন, ফাল্‌মন সাহেবের নামে বন্দুক, অবশ্য তাঁর কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য—আচ্ছা, থাক একটা! একটা আবেদনে লিখে দেবেন কত নম্বর বন্দুক রাখছেন। আর মেজবাবু থানার সীল মেরে তারিখ দিয়ে পাঁচখানা বন্দুক জমা নেবার একটা রশিদ লিখে নিয়ে যান, বন্দুক হ্যাণ্ডওভার করার পর দিয়ে দেবেন ওঁকে।'

তবুও ইতস্তত করতে লাগল পদ্মিনী। তাকে চা বিস্কুট দিলেন বড়বাবু। পদ্মিনী খেলে। বললে, 'বড়বাবু, আমি তো বি এ পাশ, আপনার অনেক জানা শোনা আছে, আমার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন?'

'চাকরি!' বড়বাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ। 'কোথায় কি চাকরি করবেন?'

'কাছে পিঠে কোনো স্কুলে মাস্টারি পেলে ভাল হয়।'

'কাছে পিঠে আপনার তো কই স্কুল নেই। বজবজে থানা, পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল, তেল কোম্পানীর ডিপো চটকল আর রেল স্টেশন বসেছে। এদেশের মেয়েরা তো এখনো চাকরি করে না। বড় সমস্যা হল!'

'খুবই সমস্যায় পড়েছি স্যার। বাড়ির আসবাবপত্র বেচতে হবে। কেবল সাহেবের একটা নেকলেস, আমার আটখানা চুড়ি আর তিনটে সোনার আংটি

আছে। আয়রন চেস্ট ফাঁকা। নীলকুঠির জমায় নেওয়া জমিও ছেড়ে দিতে হবে। পাওনাদারদের তাগাদা আছে।'

'কলকাতার সাহেব কোম্পানী ছাড়া আপনি চাকরি পাবেন না। এককাজ করুন আপনার বাবার যে বারো বিঘে জমি সাহেব নিয়ে রেখেছেন সেটা ছাড়বেন না। মেজবাবু ওঁর ভাইদের ডেকে বলে দিয়ে আসবেন তো, যেন তাঁরা গোয়াতুর্মি না করেন, তাহলে পেটাই হবে। আর আপনি গাইগরু পুষুন গোটা পাঁচেক। দুধ বেচে দেবেন। মাছ ফেলুন নীলের পুকুরে। বাড়ির ভাড়া দিয়ে দেবেন। দুটো একটা পেটের ভাত হয়ে যাবে।'

নমস্কার করে বিদায় নিল পদ্মিনী। থানার গাড়ীতে তুলে নিলেন মেজবাবু।

[১৫]

চার বছর কেটে গেল এর পর। শের আলী কলকাতার কলেজ থেকে বি এ পাশ করল। প্রতিদিন সাইকেলে গিয়ে বজবজ থেকে ট্রেন ধরতে হয়েছে তাকে।

এ অঞ্চলে সেই প্রথম মুসলমান ছেলে যে বি এ পাশ করল। তার কত মর্যাদা। তাকে দেখতে চায় মানুষ।

পদ্মিনী বি এ পাশ করে এসেছে কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে সেটা শুনলেও যেন কেউ বিশ্বাস করে না। আর মেয়েমানুষের লেখাপড়ার কি কদর আছে গ্রামাঞ্চলে? তাছাড়া মাইল দুয়েক দূরে থাকে পদ্মিনী সেই কামরা গাঁয়ের নীলকুঠিতে।

ধর্কেবেড়িয়ার প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল তখন বাখরাহাট হাইস্কুলের মাস্টারিতে আর ঋণ-সালিসি বোর্ডের সভাপতির কাজে যোগ দিয়ে পরে সেসব ছেড়ে দিয়ে সরকারী গেজেটেড অফিসার হয়েছেন।

শের আলী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল একদিন। তখন তার ঠাকুরমা আসমা খাতুন মারা গেছে। বাবা ফতেহার মৌলবী লিভার আর কিডনির রোগে অসুস্থ। ভাই তিনজনের দুজন বিয়ে করে জমি-জায়গা চাষ করে —ছোটভাইটি বাড়িতে মুদি-দোকান চালায়।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এর ক্ষমতা অনেক। গ্রামাঞ্চলে শালিশীর হর্তাকর্তা।

শের আলী হাকিম হবার পর লোকজন বিচার চেয়ে আসে বাড়িতে। বৈঠকখানায় চেয়ার-টেবিল, টানা-পাখা বসেছে।

একদিন পদ্মিনী আর তার তিনভাই এসে হাজির হল।

শের আলী দেখল পদ্মিনীর চেহারা ঠিক তেমনিই আছে। বি-এ পাশে মেয়েটির মর্যাদায় বেধে ছিল বোধহয় এণ্টান্স পাশ শের আলীকে বরণ করে নিতে। বড় অহঙ্কারী মেয়ে। বিয়ে হল না অথচ বৈধব্য পালন করছে। জনার্দনের কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছে তার দিদিভাই নাকি যীশুর মূর্তির কাছে করজোড়ে প্রার্থনা না করে শিব ঠাকুরের আরাধনা করে।

পদ্মিনীর ভাইরা জানাল তাদের বারো বিঘে জমি শরিকী বখরার পর টানাটানির জন্য আর লিজ বা ভাগচাষে দিতে নারাজ। তবুও জোর করে চাষ করাতে তারা ধান কেটে তুলে এসেছে। সাহেবের সঙ্গে লেখাপড়া করে লিজ নেওয়া ছিল না। বিঘে প্রতি বছরে একশো টাকা করে দিতেন সাহেব। তারপর থেকে চার বছর আর তারা টাকা পায় নি।

শের আলী শুধোল, 'আপনাদের এখন মোট ধানজমির পরিমাণ কত?'

বড়দাদা কালীচরণ একটু তোতলা। বলল, 'তা-তা-বিঘে তিরিশ হ-হ-হ-বে।'

'একটাই তো বোন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মেজভাই দুর্গাচরণ বলল, 'ও খিরিস্টানকে জাত দিয়েছে, আর আমাদের বোন নেই।'

শের আলী হাসল। বলল, 'বোন বোনই থাকে, যাকেই জাত দিক। তাছাড়া আমি যতদূর জানি ফাল্‌মন সাহেব মিস পদ্মিনীকে বিয়ে করেন নি। উনি হিন্দু মতেই আছেন। যদিও বিধবার মতোই থাকেন।'

পদ্মিনীর গাল লাল হয়ে উঠলেও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নিচু করল। তাকে শের আলী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি চারবছর চাষ বাবদ ওঁদের কিছু টাকা দেন নি?'

'ওরা আমার ছোঁয়া টাকা নেয় নি। মায়ের হাতে দিয়েছিলাম, ঘৃণা করে ফেরত দিয়ে গালিগালাজ করেছে। মেজদা বলেছে, জমিতে এ বছর ধান তুলতে গেলে নাকি কাস্তে দিয়ে আমাকে ফেঁড়ে ফেলবে।'

'বলেছেন একথা?' শের আলী শুধোল।

দুর্গাচরণ বলল, 'হ্যাঁ বলেছি।'

'বোনকে এ রকম কথা কেউ বলে?'

'ও বোন নয় পাপিষ্ঠা।'

শের আলী রেগে উঠে বলল, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন। আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। এটা আপনার বাড়ি নয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পিঠমোড়া করে বেঁধে ধান চুরির কেস দিয়ে আপনাদের তিন ভাইকেই থানায় চালান দেবো। একটা মাত্র শিক্ষিতা বোনের ভরণপোষণের ভার নিলেন না, পৈতৃক জমি তিনি চাষ করালেন, আর আপনারা ধান তুলে নিলেন? ভাগচাষ হলে তো অর্ধেকও দেবেন? ওঁর শরিকি পাওনা নেই? মেয়ে কি আকাশ থেকে পড়ে? যান, অর্ধেক ধান খড় দিয়ে দেবেন এ বছর। সামনের বছর উনি ছ-বিঘে চাষ করে সবটাই ভোগ-দখল নেবেন। বাকি ছ-বিঘে তিন ভাই দু-বিঘে করে নেবেন। নচেৎ আমি মীমাংসা করতে পারব না। যান, বাইরে থেকে তিনভাই যুক্তি করে আসুন।'

শের আলী হঠাৎ ভেতরের দোরের দিকে তাকাতে দেখল তার মা গোলেনুর বানু বিবি পদ্মিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'মা কিছু বলবে মা?'

'না বাবা। ঐ মেয়েটিকে একটু ভেতরে আসতে বলো তো।'

শের আলী পদ্মিনীর দিকে তাকাল। পদ্মিনী যেন আনচান করতে লাগল। গেল সে শের আলীর মায়ের কাছে।

গোলেনুর বিবি তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'তুমি মামণি পদ্মিনী?'

'হ্যাঁ মাসিমা।'

'একলাই থাকো। আমার শাশুড়ি তোমাকে দেখার জন্যে কতবার বলেছিলেন। বেচারী মারা গেলেন। আল্লাহ্ তাঁর 'গোর আজাব' (কবরের শাস্তি) মাফ্ করুক। তা তুমি মেয়ে আমাদের বাড়ি কিছু খাও।'

'কি খাওয়াবেন, দিন, আমার কোনো প্রেজুডিস, মানে বাধা নেই।'

আদর করে ঘরের মধ্যে শীতল পাটি বিছিয়ে 'দস্তরখান' (ফুল কাপড়) পেতে খাওয়াল শের আলীর মা।

ভাইরা কিভাবে জ্বালাচ্ছে তাও বলল পদ্মিনী।

শেষ পর্যন্ত গোলেনুর বিবি পদ্মিনীকে বলল, 'তুমি এমন হীরের টুকরো মেয়ে, লেখাপড়া জানো, ছোঁয়াছুয়ির বা খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই। তবে কেন এমন যৌবনকালটা বিফলে নষ্ট করছ মা? পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও তো বিধবা মেয়েদের বিয়ে দিতে বলছেন। যদি খ্রীস্টান ধর্মই মানো তাহলেও তো আবার বিয়ে করতে পারো।'

'বিয়েই আমার হল না তা আবার…'

বউ দুজন হেসে উঠল। বড়বৌ বলল, 'আপনার একা থাকতে ভয় লাগে না ?'

'বন্দুক আছে। আমি ফায়ার করতে জানি। আর একজন শক্ত বুড়ো দাদা থাকে।'

গোলেনুর বানু বললে, 'তা আমার ছেলেটার ওপরে তোমার দয়া হল না কেন মা ? ও তো তোমার জন্যেই বসে থেকে আর বিয়েই করলে না।'

'আমার জন্যে।' বিস্ময়ে যেন হতবাক পদ্মিনী।

পদ্মিনীর হঠাৎ ডাক পড়ল। চৌকিদার তার নাম ধরে হাঁক মারছে।

পদ্মিনী এলো, যেন অনেকটা হাসিখুশী। আগের বিষণ্ণতা আর দুঃখিতভাব কাটিয়ে উঠেছে যেন।

শের আলীর দিকে চোখ পড়তে হাসলও একটু।

শের আলী বলল, 'মিস্ পদ্মিনী ব্যানার্জি, আপনার ভাইরা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।'

'আপনি হাকিম, আপনার মত আমারও শিরোধার্য !'

সেক্রেটারী অসিত হাজরাকে লেখাপড়া করে উভয়পক্ষকে কাগজ দিয়ে দিতে বলে শের আলী বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

ভাইরা কাগজ নিয়ে চলে যাবার পর পদ্মিনী একা বসে রইল কিছুক্ষণ হাকিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

খবর পেয়ে শের আলী আবার এসে বসল। বলল, 'সেই থেকে বসে আছেন ? ধান আপনার দিবে দেবে।'

এবার স্মিত হাসি হাসল পদ্মিনী। বলল, 'আমার বাড়ি একদিন পদধূলি দেবেন দয়া করে ? আপনার কাছে আমার কিছু বলার ছিল। একটা দিন ঠিক করুন যেদিন অবসর করে যেতে পারবেন।'

'মাসখানেকের মধ্যে আমার সময় হবে কি ?' ক্যালেণ্ডার দেখে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবার পর শের আলী বলল, 'আচ্ছা, আমি ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তার রবিবার দুপুরে যাবার চেষ্টা করব। আর সেই সময় আপনার ভাইদের কাছেও যাব আমি, যাতে আপনার পাওনা ধান খড় ইত্যাদি দিয়ে দেন। ফাল্গুন মাসে নিশ্চয়ই ধান ঝাড়া হয়ে যাবে।'

'আপনার অসীম দয়া।'

'ঠিক আছে পরে কথা হবে।' শের আলী অবার উঠে পড়ল।

পদ্মিনী চলে এলো। হাঁটা পথে নোদাখালীর বিরান হয়ে পড়ে থাকা জোলো-খাঁ কাজীর মসজিদের পাশে এসে হঠাৎ যেন এই দুপুর বেলাতেও তার গা-হাত শিউরে উঠল। অভিশপ্ত এই বাগানটি! আর একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। ভাস্কর মণ্ডলরা এই ঘোষের বাগান কিনে নেন জমিদারের কাছ থেকে। তাঁরা যে বাগানীকে বসান তাদের কাছ থেকে ফল-ফসল ঠিকমতো না পেয়ে বিরোধ বাধার পর প্রকাশ্য দিবালোকে বাগানীদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। মেয়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে চুল এলো করে ছুটোছুটি করে। মামলা হয়। থানার দালাল বাগানীদের কাছ থেকে একবিঘে জায়গা আদায় নেয়। বাকি জমির অর্ধেক মণ্ডলরা মুন্সীদের বেচে দিয়ে মামলার দেনা শোধ করতেই ফেল হয়ে যান।

বাড়িতে আসার পর পদ্মিনী জনার্দনকে জানায় আজ সে কিছু খাবে না। শের আলীদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে। জমির ব্যাপার কি হল তাও দু'এক কথায় জানিয়ে দেয়।

তারপর সে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে। লেপ মুড়ি দেবার পর তার চোখে যেন শান্তির নিবিড় ঘুম নেমে আসে।

প্রতীক্ষার দিনে যেন আর কাটতে চায় না। পথের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে পদ্মিনী—কত লোক যায় আসে কিন্তু শের আলীর দেখা পায় না সে। জনার্দন একদিন জানায় হাটে বাজারহাট করতে গিয়ে ফেরার সময় নাকি শের আলীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সাহেবান বাগিছা গ্রামে বিচার করে ফিরছিল। দাঁড় করিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করল। কেবল পদ্মিনীর কথাই জিজ্ঞেস করে!

[১৬]

শীতকাল কাটার পর আরাম দায়ক গরমের আমেজ লেগেছে বসন্তকালের। বঙ্গোপসাগর থেকে সুন্দরবন পাড়ি দিয়ে দখিনে বাতাস ছুটে চলছিল; গাছপালা থেকে হুহু শব্দে পাকা পাতা ঝরে পড়ছিল। ফসল ওঠা মাঠে গরুছাগলগুলো আনন্দে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে।

মাথার ওপরে শঙ্খচিল চক্কর মেরে মেরে ডেকে ফিরছিল। ছাতারে পাখিরা

বাঁশতলার নিচে মিটিং বসিয়ে চেঁচামেচি জুড়েছে। শালিকরা ধান খুঁটে খেয়ে এবার কুঠি তুলে নিয়ে গিয়ে নারকেল-তালগাছের কোটরের মধ্যে বাসা করে ডিম পেড়ে বাচ্চা তোলার কাজে ব্যস্ত। কোকিলের ডাক শোনা যায়।

বিল ছেঁচা মাছের এখন আমদানি। আলু কফি টম্যাটোর চায এসেছে। বিস্কুট আর পাটালী ব্যাপারীরা দোরে দোরে ফিরছে হাঁক দিয়ে।

ডাল বেটে বড়ি দিতে বসেছে বাড়ির গিন্নিরা।

গাই দুইছে কোনো বউ হাঁটুর মধ্যে পেতলের বালতি ধরে—পাশ দিয়ে বগলের মধ্যে মাথা গলিয়ে তার বাচ্চাটাও বুকের দুধ চুষে নিতে গিয়ে ব্যস্ত করে তুলছে। সকালে স্নান করা বউটির সিঁথিতে টকটকে চওড়া সিঁদুর। হাতে মোটা শাঁখা।

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তার রবিবার এসে পেঁছোয়। শেরআলী সরদার সাইকেলে চড়ে বেলা আটটার পরেই বাজারে চলে আসে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাজ স্থগিত পড়ে রইল। লোকজন এসে বসে থাকবে। তাই বেশি সকালেই সে বেরিয়ে পড়েছে যাতে কেউ না আটকে দিতে পারে।

বাড়ির নালা, আল্‌আটন, গাছপালা, জায়গাজমি নিয়ে বেশি ঝগড়া মারামারি। মুসলমানদের মধ্যে বউ নিয়ে গণ্ডগোল, তারপরে তালাক। রাস্তাঘাটে মাটি দেওয়ার কাজ চলছে। চোরধরা, খুন খারাবি—কত রকম কেশ আছে। সবই আজ পড়ে থাক। রোজই তার স্নান খাওয়ার সময় থাকে না। দেশে বা দশের কাজ করতে গেলে নিজেরটা ডুবে যায়।

শের আলীর কাছে আজ যেন একটা বিশেষ আনন্দের দিন। পদ্মিনীর কাছ থেকে সে নিমন্ত্রণ পেয়েছে।

কি কি কিনবে সে ঠিক করার আগেই বড় কাপড়ের দোকানে ঢুকে যায়। তাকে করজোড়ে নমস্কার জানায় দোকানদার। ইতিমধ্যে তার তার পরিচয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাল একখানা শাড়ি নেবার পর তার সঙ্গে মানানসই সায়া ব্লাউজও নিল। পায়ের আন্দাজ বুঝে জুতোও কিনল। বলে রাখল বদল করতেও পারে। লেডিজ রুমাল নিল খান চারেক। প্রসাধনী তেল, সাবান, সেণ্ট-চিরুনী। একভরি সোনার হার আর আটআনা ওজনের আংটি কিনল।

হাঁড়িভরা রসগোল্লা, সন্দেস, মিহিদানা, কালোজাম আর সীতাভোগ নেবার পর ফুলের তোড়াও নিল একটা।

সাইকেলের সামনে পিছনে সেসব বেঁধে নিয়ে বেলা ঠিক এগারোটার পর নীলকুঠির বাড়িতে এসে হাজির হল শের আলী। বুকের ভেতরে তার ধড়াস ধড়াস করে স্পন্দন হতে লাগল।

সাইকেলের সে ঘন্টি বাজাল না। চুপিচুপি গিয়ে চমকে দেবে আজ। দেখল বাইরে জাল শুকোচ্ছে। জনার্দন তাকে দেখে বলল, 'সালাম বাবু।'

'সালাম। দিদিমণি কই?'

'ওপরে আছেন। যান'

'বাঃ! গাইগুলো তো চমৎকার।'

'পাচটা গাইগরুর তিনটে এখন দুধ দেয়।'

হঠাৎই ফুলের থোকে, কাপড়, জুতোর প্যাকেট নিয়ে দোর গোড়ায় এসে হাজির হল শের আলী। পিছনে তার মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে জনার্দন।

পদ্মিনী উৎফুল্ল হয়ে যেন বালিকার মতো ছুটে এসে ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে বুকে ধরল। বলল, 'এত কিছু আমার কি দরকার ছিল! আসুন, বসুন। কেবলই ভাবছি—আসবেন কি—কত কাজ আপনার।'

'আমি কথা দিলে তা রক্ষা করতে চেষ্টা করি।'

শের আলী সঙ্গে আনা মালাটা পরিয়ে দিল পদ্মিনীর গলায়।

পদ্মিনী উঠে গিয়ে আয়নায় একবার দেখল নিজেকে, খুশীতে হাসল সে। তারপর কাছে এসে মালাটা খুলে পরিয়ে দিল শের আলীর গলায়। বসে পড়ল হাঁটু ধরে।

শেরআলী তাকে তুলে ধরল। মুখখানা ধরে দেখল। ঠোঁটে কাঁপন আর হাসি কিন্তু দু-চোখ উপচে জল নামছে পদ্মিনীর। হঠাৎ সে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল শের আলীর।

শের আলী বলল, 'এতদিন পরে জানলাম তুমি আমার।' তারপর বুকের ওপর মুখ চেপে বালকের মতো ফোঁপাতে লাগল দু-হাতে পদ্মিনীকে আঁকড়ে ধরে। অবরুদ্ধ অভিমান যেন ভেসে যেতে লাগল বন্যার বেগে। বলল, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন পদ্মিনী?'

'ভুল, আমারই ভুল—আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

হঠাৎ ফাল্মন সাহেবের ছবিটার দিকে শের আলীর চোখ পড়েছে দেখে পদ্মিনী সেটা উল্টে দিল

গলার মালাটা খুলে পদ্মিনী খোঁপায় জড়িয়ে নেবার পর বাক্স খুলে সোনার হার আর আংটি পরিয়ে দিল শের আলী।

পদ্মিনী মহা খুশী।

শাড়ি আর জুতোর প্যাকেট দিতে খুলে দেখল পদ্মিনী। বলল, 'আজ আমি রাণী হয়ে গেলাম। এক্ষুনি সব পরব কিন্তু তোমাকে তো জলখাবার দেওয়া দরকার।'

প্লেট এনে হাঁড়ি থেকে মিষ্টি বার করে জল গড়িয়ে দিল। শের আলী প্রথমে পদ্মিনীর গালে একটা রসগোল্লা দিতে গেলে পদ্মিনী বলল, 'আমাকে আগে খাওয়াতে হয়, তুমি আজ আমার রাজ অতিথি।'

'না' তুমি আগে খাবে। তুমি অভিমানিনী। তাছাড় আমি এনেছি, তোমার জন্যই।'

'বেশ বাবা, তাই খাচ্ছি, দাও।' পদ্মিনী একটা মিষ্টি খাবার পর শের আলীকে খাইয়ে দিতে লাগল। বলল, 'জানো আমি সকাল থেকে জলস্পর্শও করিনি, যদি না আসতে সারাদিন উপোস করে থাকতাম।'

'আমিও সকাল থেকে কিছু খাইনি।'

'না, আর খেতে দেবো না এখন। মোরগের বিরিয়ানী করেছি, মাছের কালিয়া, পায়েস দই, সেসব কে খাবে?'

'আমিই খাব। রাক্ষসের মতো সব খেয়ে আজ মরব।'

'মরবে কেন, বালাই ষাট!'

'সাহেবর সেই বুটজোড়াটাকে এখনো চকচকে করে রেখেছ?'

'তোমার জন্যই রেখেছি। ঐ জুতোই যত নষ্টের গোড়া। তুমি বিত্তবান বাড়ির শিক্ষিত রুচিশীল ছেলে হয়ে কিনা অন্য একজনের ব্যবহৃত জুতোও পরে নিলে? তোমার মনের মধ্যে এতখানি কাঙালপনা।'

'দূর হও! আমি ঠাণ্ডায় তখন মরি। চটি ছিঁড়ে যেতে ঘোড়া ছোটানোর সময় একটা আবার পড়ে গেল—তেমনি ঝড় বৃষ্টি চলেছে—আর রাতের আঁধারে জুতোর খোঁজ পেলাম না। তাই পরেছিলাম। মনের মধ্যে অবশ্য ঘৃণা হয়েছিল। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তোমার মন বিগড়ে গেল?'

'আরো কারণ ছিল হয়তো।'

'এক, আমার তাড়াতাড়ি সময় না দিয়ে পদক্ষেপ। দুই, আমার লোভ— তোমার আর সাহেবের জিনিসগুলোর ওপরে।'

'ঠিক।'

'না, ঠিক নয়। সম্পূর্ণ ভুল। একটা ভয় অথবা সন্ত্রাস আমার মনকে গ্রাস করেছিল। বোধহয় সাহেবের অত্যাচারে বিরুদ্ধবাদী লোকেরা সাহেব মরার সংবাদে ছুটে এসে সব লুট করে নেবে। তোমার ওপরেও অত্যাচার ঘটে যেতে পারে। হয়তো কন্যাকুমারীর ঘাটে যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি সেদিনই আমি মজে ছিলাম। নইলে এতদিন ধৈর্য ধরতাম না। তুমি বিএ পাশ জানিয়ে অহঙ্কার করাতে আমার সম্মানে লেগেছিল। তাই তোমার যোগ্য হতে অক্লান্ত চেষ্টা করেছি। এখন আমি সফল হয়েছি।'

'আর যদি আমি অন্য কাউকে বরণ করে নিতাম?'

'তাহলেও আমি আর বিয়েই করতাম না। হয়তো পরে ফ্রাস্‌টেশনে ভুগতে ভুগতে বিবাগী হয়ে যেতাম।'

'এত ভালবাসা!'

'সাহেবের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা তেমন কিছু ছিল না। ফাল্গুন তোমার মধ্যে তাঁর লুসিকেই খুঁজে ছিলেন। বোধহয় স্বভাবে চরিত্রে তা পেয়ে ওঠেন নি। দু-দেশের আবহাওয়া গুণে আর চারিত্রিক গঠনে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ, সাহেবের ধরণ ধারণ প্রণয়-পদ্ধতি সব কিছুই ছিল যেন অন্য রকমের। তিনি মারা গিয়েই বোধহয় আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। একটা কথা এখন তোমাকে যদি বলি তুমি ভাববে আমি তোমার মন রাখার জন্য বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু সত্যি বলছি, সাহেবের সঙ্গে থাকার সেই কয়েক দিনের মধ্যেও তোমার ছবি কেন জানি না আমার মনে ভেসে উঠত। কন্যাকুমারীর ঘাটের তোমার সেই অবাক বিহ্বল দৃষ্টি—তোমার চোখের ভাষা বুঝতাম কিন্তু সাহেবের নীল চোখের ভাষা বুঝতাম না। তাতে ছিল কেবল কৌতূহল আর প্রাথমিক মুগ্ধতা। তুমি আমার দেশের মাটির ফসল যে!'

'শুধু তা কেন আমার রক্তেও আছে ঠাকুমার কুলের ব্রাহ্মণ্য রক্ত।'

পদ্মিনী বলল, 'পুরনো কথা ভেবে আর মান-অভিমান নয়—আমার ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করো। এখন স্নান করে নাও। বারোটা বেজে গেল। ঠিক সাড়ে বারোটায় আমরা খেতে বসব।'

'থানা থেকে জেনেছি, তুমি কাজ চেয়েছিলে, আমি তোমাকে আমার সেক্রেটারী অথবা প্রেসিডেন্ট পদের সহকারীর কাজ দিয়ে নিস্তার পেতে চাই।'

'আচ্ছা, সে হবে পরে। এখন আগের কাজ আগে করো; বাথরুম থেকে স্নান করে এসো। তুমি বেরুলে তারপর আমি যাব।'

'আমি নীলের পুকুরে চলে যাই; তুমি বাথরুমে ঢুকে স্নান করো—আমি সাঁতার না কাটলে আরাম পাই না।'

গামছা, তেল আর সাবান নিয়ে শেরআলী নিচে নেমে এলো। তেল মেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ নীলের পুকুরটা সাঁতার কেটে পাড়ি দিল।

সুগন্ধি সাবান মেখে স্নান করার পর বেশ আরাম লাগল। নিজের মনেই বলতে লাগল, 'ঠাকুরদাদা রমানাথ সরদার পরে ফৈজি সেখ, বাবা ফতেহার আলী মোল্লা, আমি শেরআলী সরদার। গোড়ায় আছে রামচরণ সরদার। আমিতো শালা পুরোপুরি বাঙালী। পদ্মিনী আর আমি একই। ফাল্‌মন আলাদা। আমরা কলমের গাছ। জোড় কলম। হিন্দুসমাজের নির্বুদ্ধিতায় স্বর্ণলতা, পদ্মিনী হল উচ্ছিষ্ট। মানুষের সঙ্গে বন্য প্রাণীর তুলনা? পরিত্যক্ত নিপীড়িত মানুষদের উদ্ধারকারীই তো প্রকৃত মানব বন্ধু, সেবক। হিন্দুসমাজের এইসব উচ্ছিষ্ট উদ্বৃত্তরাই তাই আজ গরিষ্ট সংখ্যক হয়ে গেছে, ঝাড়ের বাঁশ, কলাগাছ আটন ছেড়ে বেরিয়ে গেলে তাই আর দরদু নেই ওদের মধ্যে। শ্রেণী বর্ণের ভেদাভেদ না থাকলে কি তলোয়ার নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মুসলমানেরা এদেশ অধিকার করে বংশ বিস্তার করতে পারত? আমরা হলাম নল নলখাগড়ার ঝাড়। একটা পুঁতলে একশো আশীটা গ্যাজ গজিয়ে যাই। চৈতন্যদেব জ্ঞানের গোঁসাই। হিন্দুদের ভাঙন রোধ করতে ছুৎমার্গ ভেদাভেদ তুলে দিলেন। যবন হরিদাস এলেও ক্ষতি নেই। বিদ্যাসাগর নাস্তিক নন, প্রকৃত জ্ঞানী, সমাজ রক্ষক বিধবার বিয়ে দিয়ে সমাজের ধ্বংস রক্ষা করতেই চাইছেন। পদ্মিনীর মতো বাছাই সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের জন্য কোনো শিক্ষিত উদার ছেলের অভাব হল কেন? ? রক্ষিতা রাখার লোক অবশ্যই পাওয়া যায়। কলকাতা শহরে তার জমিদার মামারাও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন না? অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন পদ্মিনীকে?

বরং নীলকুঠির বাড়িওলা সুশান্ত গাঙ্গুলী ঢের ভাল মানুষ। পদ্মিনীর মতো অসহায় মেয়েটি কোথায় ভেসে যাবে ভেবে এক পয়সাও ভাড়া নেন নি। বলেছেন, থাক মা তুই, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়া। সব খবরই আমি রাখি। নীলকুঠির কর্মচারীদের বাকি মাইনে আমি মিটিয়ে দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম। পদ্মিনীর ওপরে যেন ঝামেলা না করে। জমির মালিকদের সঙ্গে দেখা করে

বলেছিলাম, জমি আপনাদের নীলচাষে বাধ্য করা থেকে মুক্ত হয়ে গেল · সেটাই তো একটা বড় মুক্তি। সাহেবের ভাইকে আমি ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড বিভিষিকার কথা না বললে তিনি হয়তো আসতেনই।—পদ্মিনীর ভাইদের বারো বিঘে জমি ফিরিয়ে দেবার কথা আজই আমি বলে আসব।

শের আলী স্নান করে ফিরে এসে দেখল পদ্মিনী নতুন শাড়ি জামা পরে ফিট্‌ফাট্‌। প্রসাধনও সেরেছে। টেবিলে খানা দিতে আরম্ভ করল। পোষাক পরে নিয়ে খেতে বসে শের আলী বলল, 'আমার বাবা এবার মারা যাবেন, ঝাল-মশলা গুরুপাক খাদ্য খেয়ে লিভারের বারোটা বাজিয়ে ফেলছেন। আমি নামের সঙ্গে 'সর্দার' লিখি বলে রাগ। মোল্লার ছেলে মোল্লাকী করলে তবে তো মোল্লা! সরদার, মণ্ডল, চৌধুরী, হালদার এসব উপাধি মুসলমানদের এলো কোথা থেকে? আমরা হিন্দু-মুসলমান একই মাটিতে জলে আবহাওয়ায় মানুষ, বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমরা বাঙালী—ভারতবাসী। আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। পদ্মিনী, তুমি দেখে নিয়ো একদিন এমন অবস্থা আসবে যখন হিন্দুদের অবরোধ উঠে যাবে, অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু হওয়াও সম্ভব হবে।'

পদ্মিনী বলল, 'বিশ্বজনীন আধুনিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রাচীন ভেদাভেদ দূর করে দেবে। নাও, খেতে শুরু করো। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'জুতো, আংটি এসব মাপ না নিয়ে কিনেও কি করে ঠিক হয়ে গেল? তোমার হিসেব জ্ঞানের বাহাদুরী আছে।'

'ঈশ্বরের কৃপায় আমার পরিমিতি বোধটা একটু আছে। নিজের প্রশংসা করাটাও অবশ্য বোকামী। কিন্তু তোমায় তৈরি বিরিয়ানীটা তোফা হয়েছে।'

তুমি নামাজ পড়ো?'

'পড়ি, কখনো সখনো—যখন খুব দুঃখ বোধ করি আর আনন্দে ভাসি তখন নামাজ পড়ি। আর দুদিন ঈদ-বকরাদে তো সামাজিক নামাজ পড়তে যেতেই হয়। একজন হিন্দু নাস্তিক থাকতে পারে কিন্তু একজন মুসলমান নাস্তিক বা কাফের বলে ঘোষণা করে সমাজে বাঁচতে পারে না—তাকে বয়কট করা হবে। সে মরার পর কবর হবে না। তার মেয়ের বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে। তার খবর চলে যাবে আরব পর্যন্ত। অন্য সম্প্রদায় থেকে আমরা মেয়ে নিতে পারি, তাদের মেয়ে দিতে পারিনা। দু-একটা একসেপ্‌শন্‌ কেস হয়ে গেলেও দেখা গেছে সে মেয়ে হেঁসেলে বা পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা পায় না। তাই মুসলিম

মেয়ে বিয়ে করলে শেষপর্যন্ত মুসলমান হয়ে যেতে হয়। মুসলমানরা তা হতে বাধ্য করেও।'

আহারাদির পর শের আলী কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করল। তারপর পদ্মিনীর ভাইদের কাছে যাবার কথা জানিয়ে উঠে পড়ল। বলল, 'তোমার কি এখন আর ধানখড় লাগবে?'

হাসল পদ্মিনী। বলল, 'কদ্দিন এখন এই ডেরায় থাকতে হয় সেটা তুমিই জানো। যাকগে, তুমি জানিয়ে দিয়ে এসো ধানখড় বা জমি আর দিতে হবে না।'

'তোমার খরচে যে চাষ হল?'

'ভাইপো ভাইঝিরা খাবে।'

হেসে বিদায় নিল শের আলী। অম্বিকা চরণের বারো বিঘে নীল চাষের জমি হাউড়ি গ্রামের মধ্যে—চকমানিক ইউনিয়নভুক্ত। তাই সেই জমির কলহ মীমাংসা করতে পদ্মিনী আর তার ভাইরা শের আলীর কাছে গিয়েছিল। কামরা গ্রামের অধিবাসী ওরা। অন্য ইউনিয়নভুক্ত। তাছাড়া নীলকুঠির সাহেবের সেক্রেটারী ছিল শের আলী—সে সব জানে বলে কামরা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়ে দেন শের আলীর কাছে।

ফালমন সাহেবের নৌকোটার মাস্তুলে শঙ্খচিল বসে আছে। নদীতে এখন সামান্য মাত্র জল। একপাল গরু পার হয়ে যায়—আসছে উলুবেড়িয়ার হাট থেকে হুগলী নদী পেরিয়ে—যাবে বিবির হাটে।

বাকস বনের বেড়ায় স্বর্ণলতার শোভা। গাছভরা বেল। হলুদবর্ণ কোলকে ফুলের রাশি। পঞ্চানন্দ তলায় কবাটি খেলছে ছেলেরা। চারদিক দাঁড়িয়ে দেখছে পাড়ার লোকেরা।

অম্বিকাচরণের বাড়ির সামনের খামারে ধানের গাদা কয়েকটি। দোতলা মাট-কোঠার সামনে বৈঠকখানা। প্রথমেই সাক্ষাৎ পদ্মিনীর মা ভানুমতী দেবীর সঙ্গে।

প্রণাম করল শের আলী। বলল, 'মা, আপনি ভাল আছেন তো?'

ভানুমতী দেবী সম্ভ্রান্ত ভদ্র সাহেবী পোষাকের যুবক ছেলেটিকে চিনলে না। বললেন, 'কে বাবা তুমি? কাকে চাই?'

'আমি পদ্মিনী দেবীর কাছ থেকে আসছি। আগে নীলকুঠির সেক্রেটারী ছিলাম। আপনার তিন ছেলেকেই ডেকে দিন—জমিজমা সংক্রান্ত কথা আছে।'

'দিনকতক আগে এই তো জমির ঝামেলা মিটিয়ে এলো বাবা চকমানিক

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে—আবার কি হল ?—ওরে ও কালীচরণ—বাইরে আয় তো একবার, দেখ, এক ভদ্দর লোক এয়েছেন।'

কালীচরণ এসে দেখে অবাক। বলল, 'আপনি প্রেসিডেন্ট বাবু ? আসুন আসুন—ব-ব-বসুন বৈঠকখানায় এসে।'

বাইরে সাইকেল রেখে গিয়ে বৈঠকখানার তক্তাপোষে বসল শের আলী। কালীচরণ সাহসী ভাই দুর্গাচরণকে ডাকল।

দুর্গাচরণ বিষ্ণুচরণকে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

শের আলী বলল, 'আপনারা কবে ধানখড় দেবেন পদ্মিনীকে ?'

কালীচরণ তো তো করে বলল, 'জ-জ-জ-জন পাচ্ছি না তো। দোব বলেছি —দো-ও-ও-ও-ওব।'

'আমার নির্দেশ মতো চলবেন তো ?'

দুর্গাচরণ বলল, 'আমরা তো সই করে এলাম।'

শের আলী বলল, 'পদ্মিনী দেবী আবার মত পালটে ফেলেছেন।'

ভানুমতী বলেন, 'কি ঝামেলা রে বাবা ! আবার মত পালটালেন কেন ?'

দুর্গাচরণ বলল, 'জমি আমাদের দেবে না নাকি ?'

শের আলী বলল, 'না। তা নয়। তিনি ধানখড় নেবেন না। আর বারো বিঘে জমির সম্পূর্ণ শর্ত আপনাদের তিন ভাইকে ছেড়ে দিচ্ছেন।'

ভানুমতী বললেন, 'তার সঙ্গে কথা হয়েছে বাবা তোমার ? তার তাহলে চলবে কি করে ?'

'তাঁর দায়িত্ব বোধহয় অন্য কেউ একজন নেবেন।' বলল শের আলী মাটির দিকে তাকিয়ে।

দুর্গাচরণ ভেংচি কেটে মাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমার তো কেবল মেয়ের চিন্তা !'

কালীচরণ বলল, 'তাহলে লেখাপড়া করা কা-কাগজগুলো ?'

'পুড়িয়ে ফেলবেন। ওঁর কাছ থেকে আপনাদের সই করা কাগজ আমিও ছিঁড়ে ফেলে দেবো।'

আর কারো মুখে কোনো কথা নেই।

শের আলী নেমে এলো খামারে।

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল শের আলী কিন্তু ভানুমতী দেবী পিছু নিয়ে বললেন, 'হাঁ গা ও-বাবা দুলাল, শোনো না।'

পাশে পাশে চলতে লাগলেন ভানুমতী। বললেন, 'তুমি যে বললে পদ্মিনীর ভার অন্য কেউ নেবে, কে সে? কেমন করে নেবে বাবা?'

'আপনার সঙ্গে পদ্মিনীর দেখা হবে—তিনিই সবকথা তখন বলবেন। ফালমন সাহেবের সাথে পদ্মিনী দেবীর বিয়েও তো হয়নি। চিরজীবন কি তিনি এমনি পড়ে থাকবেন?'

'হিন্দুর মেয়ে বাবা—একবার ঘর ছাড়লে, কলঙ্ক রটলে আর তার গতি করা যায় কি?'

'আপনারা ঘরে ঠাঁই দিতে পারতেন। ভুল একটা করে ফেলেছেন—তাছাড়া দূরে বিয়ে দিলেই বা কে জানত?'

'মেয়ের ওপর আমাদের কি টান নেই বাবা? নাড়ীছেঁড়া ধন! একলা পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা হয়। চোখের জল ফেলি। আবার নতুন কি ঝামেলা করবে মেয়েটা কে জানে বাবা। সাহেবের রূপে আর ফন্দিতে ভুলে অকালে বাপের জীবনটাও খেলে। নিজের জীবনও সুখের হল না। আবার কিছু একটা করে বসলে কে এখন দেখবে? ওর পাশে কে আছে?'

'ভগবান আছে মা। চলি আমি।' শের আলী আবার প্রণাম করল।

কুয়াশার মধ্যে সূর্যের অস্তিত্ব দেখার মতো কিছুটা অনুমান বোধহয় হয়েছে ভানুমতী দেবীর। তাই তাঁর চোখের তারায় স্নেহ-মমতা যেন দুলছিল। শের আলীর পরিচয় পাবার পর তিনি তার হাতের ছোঁয়া পায়ে লাগলেও সরে যান নি।

'থাক বাবা থাক—মায়ের কোল জোড়া হয়ে বেঁচে থাকো।' বলে মাথায় দেন। হাতে চুমু খান।

শের আলী সাইকেলে উঠলে ভানুমতী চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, 'দেখিস বাবা দুলাল, আমার পদ্মিনীকে। সে যেন আবার ভুল করে অকূলে ভেসে না যায়!'

'ভয় নেই মা, এবার তাঁর সুখের দিন আসছে'—বলে শের আলী বিদায় নিল।

পদ্মিনী সিঁড়ির মাথা থেকে দ্রুত নেমে এলো শের আলীকে আসতে দেখে। বলল, 'ওরা কি বলল?'

'কিছুই বলল না। সবাই খুশী—এই মাত্র। মা এলেন কিছুদূর পর্যন্ত কথা বলতে বলতে।'

'তাকে আমাদের কথা বলেছ নাকি কিছু ?'

'বলিনি। তবে মা বলছিলেন জমি সব দিয়ে দিলে তোমার চলবে কি করে। তাই আমি বলেছি, তার দায়িত্ব বোধহয় অন্য কেউ নেবে।'

'এই সর্বনাশ। মা তাহলে আজ আর ঘুমোতে পারবে না।'

'আমি আর উপরে গিয়ে কি করব ? চলি এখন ?"

'ধ্যেৎ! চলো তো—আজ তোমার ছুটি'। শের আলীকে হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে গেল পদ্মিনী।

বসার পর শের আলী বলল, 'আমার জন্যে কত লোক বসে আছে। আচ্ছা পদ্মিনী, তুমি জানতে, তোমাকে জ্বালাবার ভয়ে আমি নীলকুঠির কর্মচারীদের মাইনে দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'শুনেছিলাম, তখন অবাক লেগেছিল। কে দিয়েছিল তোমাকে ঐ টাকা ?'

'ঠাকুমা।'

পদ্মিনী মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'সেই দেবীকে আমার দেখাই হল না। তাঁর উদ্দেশে আমি প্রণাম জানাই।'

ঠাকুরমার আদরে আর আদর্শেই মানুষ হওয়ার কথা বলে শের আলী। নানা দিনের নানা কথা। 'তবে এটাও সত্য'—শের আলী বলল, 'ঠাকুরমার পুত্র কট্টর মৌলবী হয়ে নানান কিছু ফতোয়া জারী করলেও পুরোনো সেই স্বর্ণলতা তাঁর মধ্যে মাঝে মাঝেই বেশ উঁকিঝুঁকি মারত। তিনি গোয়ালে, গোলায়, ঘরে সন্ধ্যা দিতেন। মনসার ডালা দিতেন। লুকিয়ে পুজোর প্রসাদী খেতেন। মহোৎসবে মালসা ভোগ পাঠাতেন। ঠাকুরদা জানলেও কিছু বলতেন না। ঠাকুমার কাছে ঘুঁটে, কাঠ, আনাজ, মাছ, কঞ্চি, দুধ বেচা বারো হাজার টাকা ছিল—সব আমাকে দিয়েছিলেন।'

কিছুক্ষণ মৌনভাবে পদ্মিনী বসেছিল তারপর বলল, 'আমি তাহলে এখন কি করব ?'

'তুমি তোমার মতো থাকবে। যা বৈধ, সত্য, নীতি আদর্শ-সম্মত তাই করবে। তুমি শিক্ষিতা, তোমাকে শিক্ষা দিতে আসবে কে ?'

'তবে তোমাদের ঐ মুসলমান পাড়াটা বড় নোংরা। পথ-ঘাট বাড়ি ঘর-দোর সবই যেন আঁস্তাকুড়। ময়লা কাপড়-চোপড়।'

'ওরা এসেছে কোথা থেকে ? ওদের শিক্ষা আর অর্থনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব কি কেউ নিয়েছিল ?'

'তুমি আজ এখনি চলে যাবে ?'

পদ্মিনীর বাঁ হাতখানা নিয়ে শের আলী উলটেপালটে কিছুক্ষণ দেখল। বলল, 'মন যেতে চায় না কিন্তু সেই মন তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।'

'আবার কবে আসবে ?'

'আবার যখন নেমতন্ন করবে।'

'দুষ্টু! আচ্ছা, রোজ তোমার নেমতন্ন।'

মাথা নিচু করে শের আলী বলল, 'আমি, কবুল করে নিলাম।'

পদ্মিনী শের আলীর ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'আজই তুমি দিন ঠিক করে যাও।'

'এখনই ?'

'হাঁ! আমার আর এখানের এই ভূতের বাড়ীতে একা থাকতে ভাল লাগছে না। প্রায় সাড়ে চার বছর কেটে গেল।'

'সত্যি তুমি অনেক কষ্ট করেছ। ঠিক আছে, প্রস্তুতির জন্য মাত্র আমি দুটো সপ্তাহ সময় চাইছি।'

'প্রস্তুতি মানে কি তুমি খুব ঘটা বাজি বাজনা করবে ?'

'যদি করি।'

'না, না—মোটেই না। এমন কিছু ঘটনা নয় যে বাজি-বাজনা করে লোককে জানাতে হবে।'

'কি করা হবে মাকে জিজ্ঞেস করি। তোমাকে হয়তো এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।'

'এ বাড়িটা পড়ে থাকবে ?'

'থাকবে। আমি পাটের ব্যবসা করব। এই বাড়িটাতে গোডাউন করব। আশেপাশে অনেক জুটমিল বসছে। তবে চাষীদের জমি আমি নেবো না—তাদের পাটচাষের জন্য উৎসাহিত করব। নৌকো বোঝাই পাট চলে যাবে হুগলী নদী দিয়ে চটকলে।'

'সে মন্দ হবে না। চাকরি না করে আমাদের ব্যবসা করাই উচিত। আমিও কিছু টাকা জমিয়েছি—তোমাকে দেবো।'

মোটামুটি একটা তারিখ জানিয়ে পদ্মিনীকে আদর করার পর শের আলী বাড়ি চলে গেল। পথে ফেরার সময়ই সে শুনল যে তার বাপ মারা গেছেন।

তারপর বাড়ীর হাঙ্গামা মিটলে পদ্মিনীকে একদিন পাল্কী করে বাড়ীতে নিয়ে গেল শের আলী। কোনো রকম বাজি-বাজনা না করেই কিছু লোকজন খাইয়ে শাদি পড়ালে মসজিদের ইমামকে দিয়ে।

গোলেনুর বানু বড় বৌমাকে তাঁর শাশুড়ির জীবনকথা শোনাতেন। নামাজ পড়ার কথাও বলতেন।

শের আলী বলত, 'মা ওকে পীড়ন করো না—ও লেখাপড়া জানে—ধর্মের বইই পড়ে—যা ভাল লাগে ওর তাই করবে।'

এক বছর পরে পদ্মিনী মা হয়ে শিউলিকে আনল। সে যেন একটা মোমের পুতুল। যখন সে পাঁচ বছরের আবার দুটি একই রকম দেখতে যমজ ভাই হল। তখন তিন কাকাই জমিজমা বখরা করে দিতে চাইল। কারণ পাটের ব্যবসায় শের আলীর খুব রমারমা অবস্থা হয়ে গেল মাত্র দশ বছরেই! তাই সে এককাঠা জায়গা আর বাড়ির বখরাও নিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবার নীলকুঠির বাড়িতেই ফিরে এলো। জনার্দন দিনকতক থাকার পর হঠাৎ কেন যে আত্মহত্যা করল কেউ জানতে পারল না।

আরো বছর দশ পরে যখন তার ছেলে মেয়েরা কলকাতার হস্টেল থেকে লেখাপড়া শিখে একটা করে পাশ দিয়েছে তখন গ্রামের অবস্থা পাল্‌টে গেছে অনেক।

পদ্মিনী বিবির গুণগান গায় এখন গ্রাম শুদ্ধ মানুষ। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর কাছে উপকার পেয়েছে। শের আলীর ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ তিনিই করে দিতেন। বিচার আচার সব কিছুই। কেবল সই করতেন শের আলী সরদার।

দিনকাল সত্যিই পালটে গেল অনেক। চা-দোকান বসে গেল গাঁয়ের মোড়ে। এর মধ্যে কংগ্রেসের আন্দোলন চলেছে। গোটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে। বাজারের জিনিস পত্রের দাম হু হু করে চড়ে যাচ্ছে। মোটর ছুটেছে পথে ঘাটে।

চটকলের পাট যোগান দিতে দিতে শের আলী সরদার বেশ বড়ই এক ব্যবসাদার হয়ে গেলেন। তার কোম্পানীর নাম দিয়েছেন ইণ্ডিয়ান জুট মার্চেন্ট।

কুড়ি বছর প্রেসিডেন্ট থাকার পর মাথার সব চুল বকের পালকের মতো সাদা হয়ে গেলেও পথে ঘাটে মানুষ তাঁকে দেখে সালাম বাজায়। তিনি বাতের ব্যাথায় আর বেশি চলতে-হাঁটতে না পেরে কেবল পাটের গোডাউনে বসেই ফরমাস চালান।

কন্যা কুমারীর নদী মজে গেল। চাষীরা ধান আর পাট চাষ করে তা অধিকার করল। যারা এই অধিকার কায়েম করেছে তারাই বিরুদ্ধ অভিমত পাঠায় সরকারের কাছে।

রায়পুর গাঁয়ে পথের ধারে দশবিঘে জায়গা কিনে নতুন দোতলা বাড়ি করলেন শের আলী। তখন শিউলি বি-এ পাশ করে গেছে। কাছেই হুগলী নদী। জাহাজ যাবার সময় বাড়ির ছাদ থেকে মাস্তুল দেখা যায়। দশখানা নৌকো বোঝাই হয়ে পাট যায় ইণ্ডিয়ান জুট মার্চেন্টের শ্যামগঞ্জ-বজবজ-চিত্রিগঞ্জের পাটকল গুলোতে। জনা পঞ্চাশ লোক পাট সংগ্রহ করে।

পদ্মিনীর কানের দু-পাশের চুলেও পাক ধরেছে। সময় যেন হু হু করে চলে যায়।

শিউলি বাংলা ভাষায় এম-এ-তে ভাল রেজাল্ট করার জন্য গ্রামের দিকের একটি কলেজে লেকচারার শিপ পেয়ে যায়।

শের আলীর বড় ছেলে আকবর এম. বি. বি. এস ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে বাড়িতেই প্র্যাকটিস করছিল। আর পারভেজ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মেরিন ইঞ্জিয়ারিংয়ে যোগ দিয়েছে।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তখন। যুদ্ধের সময় উড়োজাহাজ আক্রমণও দেখেছে শিউলীরা। বোমা পড়েছে বজবজে। কামানের ছিটে এসে পড়ত বজবজের জটাধারীতলা থেকে। ব্ল্যাক আউটের রাত গেল। তারপর কংগ্রেসের আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটে গেল। সে সময় শের আলী মাত্র একশো টাকা এক বিঘে জমির দাম দিয়ে প্রায় একশো বিঘে জমি কিনে নেন।

একান্ন সাল এলো সুজলা সুফলা হয়ে।

ঈদের উৎসবের দিনে দুই ভাই আর বোন একসঙ্গে হল।

সকালে স্নান করে শের আলী আকবর আর পারভেজকে নিয়ে ঈদগাহে নামাজ পড়তে গেলেন। শিউলি আর পদ্মিনী ভোর ভোর জেগে ক্ষীর সিমাই আর লাচ্চা রান্না করেছেন। রাজ্যের লোকজন আসতে শুরু করে হিন্দু মুসলমান

নির্বিশেষে। পাট ব্যবসার কর্মীরা। লরীর ড্রাইভার, মুসলমান পাড়ার জেলে। তালপাতার কারবারী।

মোটর বাইক চালিয়ে চোখে চশমা লাগিয়ে বছর ছাব্বিশ বয়সের সুদর্শন মার্জিত গৌর বর্ণের যে যুবকটি এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে শিউলি ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। চেঁচামেচি করতে লাগল, 'মা দেখ কে এসেছেন। বাপী, ইনি অমিয় মজুমদার। আমাদের কলেজের ইতিহাসের প্রফেসার।'

আকবর আর পারভেজ তাঁকে ধরে এনে সসম্মানে ঘরের মধ্যে বসাল।

অমিয় সিঁমাই খেতে খেতে আকবরকে বললেন, 'আপনি তাহলে গ্রামেই ডাক্তারী করছেন?'

'বাবার তো সেই রকমই নির্দেশ। মোটামুটি আমার পশার জমে গেছে। তবে বেশির ভাগ রোগজীর্ণ দরিদ্র মানুষদেরই সেবা করতে হয়। ওষুধ কেনার পয়সা পর্যন্তও দিতে হয়। বহু দূরে হাসপাতাল। মানুষ যেতেই পারে না। পানীয় জলের অভাব। গরমকালে কলেরা-বসন্তর প্রায় মড়ক লাগে। কলেরা লাগলে 'খাজে খতম' করে এখনও অশিক্ষিত মুসলমান গ্রাম বন্ধ করে মস্তান মৌলবী ডেকে এনে। 'ওবা' অপদেবতায় নাকি ভর করে। আগে কেউ বাঁচত না, এখন সেলাইন দিয়ে বাঁচাই। একধার থেকে জোর করে বসন্তর টিকে দিই। সেই রকম হিন্দুরাও শীতলা পুজো করে।'

পারভেজ বলে, 'ধর্মের লোকাচার ভাল। সামাজিকতার বন্ধন সে সব। কিন্তু অর্থহীন কুসংস্কার হলে তো বুদ্ধির মুক্তি ঘটে না।'

শের আলী সাহেব বললেন, 'আমি তো এবার বেশ মুসকিলে পড়লাম বাবা অমিয়। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিতা করে এখন আবার উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম ছেলে তো পাই না। বিয়ে দিই কি করে? আধা মূর্খ মৌলবীর সঙ্গে বিয়ে দেবো?'

অমিয় বললেন, 'আপনিও এই কথা ভাবছেন?'

'ভাবতে হচ্ছে। যোগ্যতা অর্জন না করে চেঁচালেই তো ফজলুল হক মুসলমানদের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বসিয়ে দিতে পারেন না—তিনি না হয় ক'জন পুলিস-দারোগা বানালেন।'

পারভেজ বলল, 'বড় দারোগা বুবুর (দিদির) বর হলে দারুণ ব্যাপার হবে!'

শিউলি তার পিঠে চাপড় কষাল।

পদ্মিনী বললেন, 'আর ছেলে দুটো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার—তাদের জন্যও এখানের মুসলিম সমাজে লেখাপড়া জানা মেয়ে পাই কই?'

পারভেজ আবার বলল, 'আর বাছাবাছি করে লাভ নেই। আমরা বাঙালী এই পরিচয়ই তো যথেষ্ট। কর্মক্ষেত্রে আমাদের ধর্মের কোনো বালাই নেই। যৌথ সমাজের দায় ঘাড়ে নিয়ে পড়ে থাকায় সময় আর নেই। ধর্ম হল যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

পদ্মিনী জানতেন শিউলির মনের কথা। অমিয়কে সে ভালবাসে। ভাই দুজনেও শুনেছিল।

পারভেজ মাসখানেক পরে এক ইংরেজ কম্পানীর ভিক্টোরিয়া কারগো শিপের অ্যাসিসট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার হয়ে চলে যাবে। জাহাজ এখন খিদিরপুরের ডকে আছে। মেরামতি আর রং হচ্ছে।

সমুদ্রে চলে যাবে ছেলে তাই পদ্মিনী যেন পারভেজকে চোখের আড়াল করতে চান না। দিদির সঙ্গে তার মনের মিল খুব। ডাক্তার আকবর কিন্তু বাপের মতোই ভিজে বেড়াল। ঘোড়ায় চড়ে সে রোগী দেখতে যায় বলে পারভেজ তার নাম বার করেছে 'ঘোড়া-ডাক্তার'।

দুপুরের আহারাদির পর গান-বাজনার আসর বসে। অমিয় প্রথমে তবলা বাজালেন শিউলির গানে।

যখন অমিয় গাইতে বসলেন আকবর তার লাল টম্যাটো মার্কা গালে মাথা নেড়ে নেড়ে খুব তবলা বাজাতে লাগল।

শের আলী আর পদ্মিনী একটু দূরে কোচের ওপর বসেছিলেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এত দরদী গলায় অমিয় গাইছিলেন যে তাঁরা দুজনে নির্বাক বিস্ময়ে শুনছিলেন।

'অপূর্ব! এমন কণ্ঠস্বর বড একটা শোনা যায় না।' বললেন শের আলী।

পদ্মিনী বললেন, 'সত্যিই রবীন্দ্রসঙ্গীত সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।'

হঠাৎ আকবরের ডাক এলো। এক রোগীর অবস্থা নাকি খুব খারাপ।

শের আলী নিজেই তখন তবলা বাজাতে বসলেন।

আকবর রোগী দেখতে চলে গেল।

বিকেলের দিকে অমিয় মজুমদারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন শের আলী। আশ্চর্য ব্যাপার, অমিয় ইসলাম ধর্মের কোরআন-হাদিস-ইতিহাস-তত্ত্বকথা অনেক কিছুই জানেন সাধারণ মৌলবীও বোধহয় অতটা জানেন না।

শিউলিও বোনার কাজ করতে করতে চুপচাপ সব শুনছিল।

শের আলী বললেন, 'তুমি দেখছি বাপধন একজন মৌলবী হয়েই আছ, কেবল সাজপোষাকের অপেক্ষা।'

'হিন্দুধর্ম ও দর্শন নিয়েও আমি কিছু পড়াশোনা করেছি। কিন্তু সে তো অগাধ সমুদ্র। হিন্দুরা লোপ পেয়ে গেলেও তাদের উপনিষদ বেদান্ত দর্শন লোপ পাবে না। জগৎজোড়া তার সম্মান।'

স্বামীকে আড়ালে পেয়ে পদ্মিনী এক সময় বলেই বসলেন, 'অমিয়কে আমি জামাই করব।'

শের আলী বললেন, 'ছেলেটিকে আমারো খুবই পছন্দ কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে কি রকম মর্যাদা পাবে শিউলি, সেটাও তো জানা দরকার।'

পদ্মিনী বললেন, 'বিলেত ঘোরা পরিবার। কোনো প্রেজুডিস নেই ওঁদের। শিউলি গিয়ে অমিয়র মা ভাই-বোনের সঙ্গে একপাতে ভাত খেয়ে এসেছে। তারা নাকি জাত মেরেছে।'

পারভেজ বলল, 'বাপী, দিদির সঙ্গে অমিয়বাবুর বিয়ে হোক। আমি দেখে যেতে চাই।'

আকবর কিন্তু গোঁ ধরল। যে গোঁড়ামিটা শের আলীর মধ্যেও লুকিয়ে আছে। মুসলমানদের অন্য সম্প্রদায় থেকে মেয়ে নিতে আছে, দিতে নেই।

অমিয় চলে গেলেন সন্ধ্যার দিকে। পদ্মিনী শিউলিকে বললেন, 'তোদের বোধহয় অপেক্ষা করতে হবে।'

'বড়দাটা গোঁড়া।'

আকবর বলল, 'আখের ভেবে আগুনে ঝাঁপ দে। ওদের হেঁসেলে-ঠাকুর ঘরে তুই উঠতে পাবি?'

'আমাদের আধুনিক শিক্ষিত জীবনে ওসবের বালাই কিসের? ওঁদের শিক্ষিত বাড়ি।'

আকবর মাথা নেড়ে অসম্মতিজ্ঞাপক ইঙ্গিত করার পর বলল, 'মরা ছাগলের পেট টিপলে সেও ব্যা ব্যা করে ওঠে। শিক্ষিত করে জীবনের আধুনিকতা-সংস্কৃতি ওসব রাংতা, বইয়ের খোলস।'

শিউলি খুব রেগে গেল। বলল, 'তুই এবার দাঁড়ি রাখ। মোল্লা হ। হিন্দুদের আঁস্তাকুড় ঝেঁটোনো সুন্দরী বিধবা মেয়ে পেলেই ঠাকুরদা আর বাবার মতো মাথায় তুলে নিয়ে নাচবি।'

আকবর তখনি মাকে গিয়ে বলল, 'তোমরা হিন্দুদের আঁস্তাকুড় ঘেঁটোনো পাতা—শিউলি বলল। ওকে বাড়ি থেকে বার করে দাও।'

পদ্মিনী মেয়ের কথায় রাগ করলেন। পারভেজ সমুদ্রে চলে যাবে বলে তার বিয়ে আগেই দেবার জন্যে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন শের আলী।

তাঁর কোম্পানীর মাল বুঝে নেবার শ্যামগঞ্জ চটকলের বাবু বিরিঞ্চিলাল সাউ জানালেন মেদিনীপুর শহরে এক ধনী মুসলমান বাড়িতে একই রকম ছুটি যমজ কন্যা আছে—তারা এট্রান্স পাশ করেছে।

শের আলী বললেন, 'আমার ছেলে ছুটিও তো একই রকম দেখতে। চলো একদিন যাওয়া যাক।'

লরী ছুটিয়ে মেয়ে দেখে পসন্দ করে এলেন শের আলী। পদ্মিনীও গিয়েছিলেন। তাঁরও পসন্দ মেয়ে ছুটি। হাসি খুশী ফুলের মতো যেন তারা।

কন্যাপক্ষ দেখে যাবার পর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

প্রায় শতখানেক বরযাত্রীর সঙ্গে লরী-মোটর চড়ে দুজন বরের মাঝখানে বসে গেলেন অমিয় মজুমদার। বেঁধেছেন তিনি শাহী পাগড়ি। শিউলি পরিয়ে দিয়ে বলেছে, নিতবর বলে কথা!'

বিয়ের পর কনে নিয়ে ফেরার সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল।

বাড়িতে ফিরতে রাত হল।

কিন্তু কনে দুজন যে একই রকম দেখতে! দুজনেই লাল বেনারসী পরা। সোনার গহনায় গা ঢাকা। দুজনের নাম রুম্‌নী আর ঝুম্‌নী। ভাল নাম আসিয়া আর নাজিয়া।

সাতদিন পরে পারভেজ নাজিয়াকে নিয়ে চলে যাবে, তাই বাপের বাড়ি একবার ঘুরতে গেল দুইবোনই।

কিন্তু রুমনী কেবল গোলমাল বাধায়। বলে, 'আমি তো ঝুম্‌নী আমাকে বৌদি বলছ কেন?'

পারভেজ ঠকে যায়। শেষে সে ঝুমনীর হাতে তার কালো পাথর বসানো আংটিটা পরিয়ে দিল। কিন্তু সে পাথর তার নাকি ক্ষতি করবে এমন কথা রুমনি জানাতে সে খুলে রাখল। আংটিটা পরার পর থেকে মাথার যন্ত্রনাও হচ্ছিল ঝুমনীর।'

অনেকটা রাত পর্যন্ত গল্পগুজব হবার পর শুতে গেল পারভেজ। পাশাপাশি দুই ঘরে দুই যমজ কন্যা থাকে। ডানদিকের ঝুমনীর ঘরের দোর খোলা ছিল।

অবশ্য ভেজানো। টর্চ জ্বেলে দেখল ঝুম্‌নী ঘুমোচ্ছে। মুখটা দেখে যেন সন্দেহ হল। রুমনী তো সব সময় উলট পালট করে দেয়। মাঝখানে দোর খোলা কেন ওঘরের? ঠেলতে কপাট খুলে গেল। দেখল যমজ কন্যার আর একজন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আংটি নেই কারো হাতে। কে তাহলে ঝুম্‌নী?

তিন চার রাত ওদের ভাল ঘুম হয়নি—এখন মরার মতো ঘুমোচ্ছে দুই বোন। দুজনের সবকিছু একই রকম!

হঠাৎ আকবর ঘোড়া ছুটিয়ে সেই মাঝরাতে এসে হাজির। তার মাথায় সমস্যা ঢুকেছে যদি পারভেজ নষ্টামি করে? ওর কি কিছু বাছ-বিচার আছে?

এক মিনিট আগে হওয়া সম্মানিত ডাক্তার দাদার ঘোড়া ছুটিয়ে আসার খবর শুনে পারভেজ চকিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

কোনো দুঃসংবাদ বয়ে আনে নি আকবর, শুধু নাকি কৌতুহল ঘোড়া ছুটিয়ে সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মেদিনীপুরে আসা যায় কিনা। ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে নুরপুরে এসে হুগলী নদী পার হয়ে গেঁয়োখালি মহিষাদল হয়ে এসেছে। ঘোড়া ছুটিয়ে সরু দুটো নদী পার হতে হয়েছে। লোকে তাকে মনে করেছে পাগল!···

আকবরের আহারাদির পর পর্যন্ত বসে থাকতে হল পারভেজকে।

প্রথম ঘরে গেল পারভেজ, দ্বিতায় ঘরে গেল আকবর।

টর্চ জ্বেলে দুজনেই দুজনকে দেখল। চিনতে পারল না।

যখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে নাজিয়া শুনল তার ঘরে এসেছে ভাসুর। তখনই বেরিয়ে গেল সে বাইরে।

মাকে ডেকে তুলে বললে, 'তোমাদেরও কি বিবেক বলে কিছু নেই?'

'কেন কি হয়েছে?' মা শুধোলেন।

'যা হবার তাই হয়েছে। আমি আর মুখ দেখাতে পারব না!'

'তুই নাম জিজ্ঞেস করলি না কেন?'

'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম—তখন। আমি এখন কি করব?'

'চুপ করে থাক।' রুমনীকে তিনি ডেকে তুলে বললেন, 'তুই সর্বনাসীও ঠিক করতে পারলি না?'

'কেন মা? কি হয়েছে?'

'তোর বর তো ডাক্তার?'

'হাঁ।'

'সে ঝুমনীর ঘরে গেছে। আমারও জ্বরভাব হয়েছে আজ। কি কেলেঙ্কারী হল!'

ঝুম্‌নী ফিরে গেল। বলল, 'তুমি ডাক্তার নও?'

'না, ইঞ্জিনিয়ার।' পারভেজ আমেদ।

'কী কেলেঙ্কারী!' বেরিয়ে গেল রুমনীও।

সেই ভোররাতে চাঁদনীচকের বালাখানার নিচে জ্যোৎস্না রাতে তারা কাঁদতে লাগল।

দুই ভাইয়ের তখন মারামারি লেগে যাবার উপক্রম হল।

শান্ত করলেন তাদের শ্বশুর মশাই। বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে বাবা, এতো ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। এটা লোকে না জানলেই হল। শুনেছি, ভাইয়ে ভাইয়ে তোমাদের খুব মিল—কাজেই এটাকে যদি···'

আকবর বলল, 'আপনি একটি গর্দভ!'

ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল সে কুয়াশা ভেদ করে।

সকালে পারভেজও বিদায় নিল।

তিনদিন পরে সংবাদ এলো দুই বোনই আত্মহত্যা করেছে।

শের আলী আর পদ্মিনী মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

পরের দিন সকালে পারভেজ লটবহর নিয়ে জাহাজের কাজে চলে গেল। যাবার সময় বলল, দিদির বিয়ে দিস অমিয়বাবুর সঙ্গে।'

আকবর রোগীদের সামনেই বলে দিল, 'তুই বিসমিল্লা বলে শুয়োরের মাংস খা গিয়ে।'

হাসতে হাসতে পারভেজ চলে গেল।

পদ্মিনী চোখ মুছতে লাগলেন।

[১৮]

শিউলি বরাবরই ছিল রাজনীতি ঘেঁষা। এক কংগ্রেসী সভায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বক্তৃতা করল। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি দিল সকলে।

ফলে সেদিন ভোর রাতেই শিউলি এ্যারেস্ট হল। শিউলির ঘর থেকে পুলিস সুপার আপত্তিকর অনেক কাগজপত্র আবিষ্কার করলেন।

তিনবছর পরে জেল ফেরত অত্যাচারিতা কংকাল সার শিউলিকে নিয়ে এল অমিয় মজুমদার।

শিউলি বলে, 'আমি আর বাঁচব না গো।' 'আমার ওপর পশুর মতো অত্যাচার করেছে সভ্যজাতির সরকার।'

'সে অপরাধ তোমার নয়।'

আকবর শিউলির ব্যবহার চলনে কোনো কালেই সন্তুষ্ট ছিল না। তার এই অসুস্থ রুগ্নতায়ও তাকে দেখতে চাইল না।

অমিয় নিজে ডাক্তার আনলেন।

তার ধৈর্য অসীম। তিনি কলেজ করার পর রোজই আসতেন। শিউলীকে

নিয়ে বেড়াতে যেতেন নদীর ধারে। হুগলী নদীর ওপর মাতাল ঢেউগুলি ছলাৎ ছলাৎ করে। গান গেয়ে শোনাল অমিয়।

ছ-মাস পরে শিউলি সম্পূর্ণ সেরে উঠল। তেমনি হাসি খুশী চেহারা। মুসলিম মতে তাদের বাড়িতেই বিয়ে দিলেন বাবা-মা। অমিয় বউ নিয়ে যাবার পর তাঁর বিলেত ফেরতা ব্যারিষ্টার বাবা ইন্দ্রনাথ মজুমদার হিন্দু মতেও আবার বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন।

পদ্মিনী খুব খুশী। শের আলীকে হেসে বললেন, 'এতদিন পরে আমি শোধ নিলাম!' শের আলী কেবল একটু কৃত্রিম হাসি হাসলেন।

কিন্তু গ্রামের মুসলমানরা নাকি শের আলীকে একঘরে করবে বলে শাসিয়েছে শুনলেন শের আলী। এর মধ্যে যে আকবরের হাত আছে তাও বুঝলেন।

শের আলী বললেন, 'বয়ে গেল। কি করবে আমার? টাকা আছে যার তার দিকে সবাই ছোটে। আমাদেরও আর দায় নেই। মরণের আগে দুজনের কবর তৈরি করে রেখে যাব। লাস পড়ে পচতে থাকলে আকবর ছেড়ে তার বাপকে কবর দিতে হবে।' দিনকতক গরম থাকলো মুসলমানরা।

শুনে আকবর শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল শুধু।

কিন্তু পদ্মিনীর কথায় শের আলী মত পালটালেন। কার জন্যে তিনি রেখে যাবেন? কে হবে মতওয়াল্লী বা রক্ষক?'

পারভেজ বিয়ে করেছে এক ফরাসী মেয়েকে। প্যারিস থেকে কলকাতা ফেরার সময় নাকি দু-দিনের জন্য আসবে চিঠি লিখেছে।

হাইস্কুল, বাজার, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, মসজিদ করে দিলেন শের-আলী সর্দার। শিউলিকে জমি দিলেন ২৫ বিঘে। পদ্মিনীর নামে রাখলেন বিঘে ২৫।

বাকি পঞ্চাশ বিঘে হাইস্কুল, লাইব্রেরী, বাজার ইত্যাদি করতে ফুরিয়ে গেল। আকবরকে এককাঠাও জমি দিলেন না। বললেন, 'ডাক্তারী পাশ করিয়ে দিয়েছি—ঐ যথেষ্ট।'

কিন্তু আকবর বাপকে পরোয়া করে না। ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে চলে যায় যখন দেখে পথের মানুষজন পাকা মাথা বুড়ো রুপোর বাঁট লাগানো ছড়ি হাতে শের আলী সাহেবকেই বেশি 'আদাব' করে।

পদ্মিনী একা বসে ভাবেন নীলকুঠির সাহেব ফালমনের কথা। বাবা অম্বিকা চরণ তাঁর চুল ধরে হিঁচড়ে টেনে আনছেন আর ফালমন এসে রুখে দিয়ে হাত বাড়াতেই তাঁর বুকের ওপর চলে গেলেন।···

ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তিনি ছুটেছেন কন্যা কুমারীর জল ছিটিয়ে দিয়ে। জলের বিন্দুগুলো মুক্তোর দানার মতো।···

ফালমন ছুটেছেন—তার যেন আর বিরাম নেই।

—: সমাপ্ত :—